গ্যারাজের দরজা দিয়ে যে কেউ নামতে পারবে ইয়টে। দু'জন নেমে গিয়ে দড়ি বাঁধল। দালমার আলীকে পাইলট হাউসের নীচের এক কেবিনে নিয়ে গেল রানা ও সিলভিও। লোকটার হাত-পা বাঁধা। শুইয়ে দেয়ার সময় বাঙ্কের সঙ্গে খটাং করে লাগল মাথা। তাকে এক পলক দেখল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'জগতে এমন জেল নেই যেখানে যথেষ্ট শাস্তি হবে তোমার।'

ডেকে বেরিয়ে ওরা দেখল, নবী আর রায়হান মিলে হাকিম ও শাহিনকে বসিয়ে দিয়েছে দুটো ফিশিং চেয়ারে। ডানহাতে ছিপ, বাঁ হাতে খালি বিয়ারের বোতল। ঘুমে বিভোর।

সিলভিওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোট গ্যারাজে উঠে পড়তে যাচ্ছিল রানা, টেনে ধরল সে হাতটা।

'দোস্ত, তোর সাহায্য না পেলে...'

'রাখ্ তো ওসব!' ধমক দিল রানা। 'তা হলে কিন্তু আর কোনদিন কোনও সাহায্য নেব না তোর।'

হাসল সিলভিও, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে, তারপর ছেড়ে দিল।

ক্রুরা পিছু নিল রানার। দড়িগুলো খুলে নেয়া হলো।

মিশরের দিকে রওনা হয়ে গেল সিলভিওর ইয়ট।

ইন্টারকমে স্বর্ণার কণ্ঠ শুনল রানা: 'মাসুদ ভাই, বিসিআই থেকে মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান।'

'লাইন দাও,' নিচু স্বরে বলল রানা। একটু চমকে গেছে। বুকের ভিতর ছলাৎ করে উঠছে উষ্ণ রক্ত।

'রানা,' ভেসে এল জলদ গম্ভীর কণ্ঠ। 'কাজ শেষ?'

'জী, স্যর। এইমাত্র শেষ হলো।'

'বেশ। রিপোর্ট পাঠাও।' সামান্য বিরতি। 'এবার কত দ্রুত ত্রিপোলিতে পৌঁছতে পারবে?'

'সুয়েজ খাল হয়ে ত্রিপোলিতে, স্যর? ট্রাফিক কম থাকলে চার

দিন।'

'আমাদের প্রধানমন্ত্রী শান্তি মহাসম্মেলনের জন্য প্রাথমিক আলাপ সারতে রওনা হন, কিন্তু তাঁর বিমানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগ। ধারণা করছি, ভূ-পাতিত হয়েছে বিমানটা।'

'স্যাবোটাজ?'

'দুর্ঘটনাও হতে পারে।'

'তিন দিনের ভিতর পৌঁছতে পারব, স্যর।'

'ঠিক আছে। পরবর্তী নির্দেশ সময় হলেই পাবে। রওনা হয়ে যাও।' খুট্ করে কেটে গেল লাইন।

আট

অনেক নীচে তপ্ত সাহারা।

দশ হাজার ফুট উপরে গোঁ-গোঁ আওয়াজে ছুটছে বাংলাদেশ বিমানের এয়ারবাস। কয়েক ঘণ্টা আগে নিউ ইয়র্ক ছেড়েছে। এখন চলেছে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে। পৌঁছুতে বড়জোর আর এক ঘণ্টা।

এইডরা ফিসফিস করে আলাপ করছেন।

সামনে, বাঁ পাশের সিটে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিছুক্ষণ আগে পড়ে শেষ করেছেন মহাসম্মেলনের জন্য তৈরি কাগজপত্র। তারপর চোখ বুজে মনে মনে সুরা ইউনুস পাঠ করলেন পৃথিবীর সব মানুষের মঙ্গল কামনা করে। মনে পড়ছে তাঁর, সেই ছোট বেলায় বাবা বলতেন, 'আম্মু, আল্লাহ্ ও রাসুলের উপর বিশ্বাস

রাখবি। সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবি, ইনশাল্লাহ্।'

বাবার সেই কণ্ঠ এখনও মনে পড়ে তাঁর। সত্যি, এই জীবনে মস্ত সব বিপদে পড়েছেন। কখনও হাল ছেড়ে দেননি। ভরসা রেখেছেন আল্লাহর উপর। তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে অনেকে। বারবার নিজ বাড়িতে গৃহ-বন্দি হয়েছেন। গুলি করা হয়েছে তাঁকে লক্ষ্য করে। বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে সন্ত্রাসীরা। মনে মনে বারবার বলেছেন, 'রাব্বুল আলামিন যা চান তা-ই ভাল। আমি শুধু তাঁর উপর ভরসা রাখলাম।'

এখনও স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলেন, ওই মহাসম্মেলন যেন সফল হয়। বহুকিছু রয়েছে দেয়ার, বহুকিছু রয়েছে পাওয়ারও।

বাস্তবে ফিরলেন তিনি, গ্রীবা ডানদিকে ফিরিয়ে জানতে চাইলেন, 'আশরাফ ভাই, কতক্ষণ লাগবে ত্রিপোলিতে পৌঁছতে?'

'পাইলট বলেছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নামছি। ওয়েট্রেস আপনাকে কিছু এনে দেবে?'

'এক গ্লাস পানি।'

চেয়ারের বাটন টিপে দিলেন সালাম বিন আশরাফ, আসতে বলছেন এয়ার ওয়েট্রেসকে।

এক তোড়া কাগজ তুলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। এগুলো বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ডোশিয়ে। সঙ্গে বায়োগ্রাফি ও ফটোগ্রাফ। এঁরা আসছেন মহাসম্মেলনে যোগ দিতে। বহুবার এসব কাগজ পড়েছেন তিনি। তবুও নিশ্চিত হতে চাইছেন কিছু যেন বাদ না পড়ে। কার কী অভ্যাস, কারা মন্ত্রী, ক'টা স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কিছুই বাদ পড়েনি।

এখন কেউ জানতে চাইলে গড়গড় করে বলে দিতে পারবেন তিনি।

সুন্দরী ওয়েট্রেস এসে ট্রেসহ পানির গ্লাস বাড়িয়ে দিল।

'ধন্যবাদ।' ওটা নিলেন প্রধানমন্ত্রী, এক চুমুক পানি খেয়ে

পাশে রেখে দিলেন গ্লাস। প্রথম কাগজটা পড়ছেন। লিবিয়ার নতুন ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলী যে কারও মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। ছোটখাটো ডোশিয়ে। লেখা হয়েছে মোহাম্মদ ফতে আলী নিচু পর্যায়ের সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন। তারপর মনোযোগ কাড়েন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির। মাত্র একটিবার মিটিং শেষে গাদ্দাফি তাঁকে ফরেন মিনিস্টার করেন। এবং এরপর গোটা বিশ্বে চরকির মত ঘুরে বেড়িয়েছেন ভদ্রলোক। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শীতল ব্যবহার পান। পরে দেখা গেল তাঁর চমৎকার ব্যক্তিত্ব সবাইকে আকর্ষণ করছে। মধ্য-প্রাচ্য জয় করে এশিয়ার অন্য দেশগুলো, ইউরোপ, আমেরিকা— সবখানে গেছেন। শুরু থেকেই শান্তি মহাসম্মেলনের জন্য তাঁর চেষ্টায় আন্তরিকতার কোনও অভাব দেখা যায়নি।

পাশের সারির সিটে বসেছেন সালাম বিন আশরাফ।

মোহাম্মদ ফতে আলীর ছবি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ফরেন মিনিস্টার রয়ে গেছেন নিউ ইয়র্কে, নইলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন। 'ছবি দেখে কী মনে হয়, আশরাফ ভাই?'

ছবিটা নিয়ে জানালার পাশে চলে গেলেন ভদ্রলোক, মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। অফিশিয়াল ফটোগ্রাফ, মোহাম্মদ ফতে আলীর পরনে পশ্চিমা সুট। চমৎকার মানিয়েছে। ফুটে বেরিয়ে আসছে সুস্বাস্থ্য। চুলগুলো কাঁচা-পাকা। গোঁফে পাক ধরেছে। মানানসই ঠোঁটে মৃদু হাসি।

ছবিটা ফিরিয়ে দিলেন আশরাফ। 'ভুল লোকের কাছে জানতে চাইছেন, আপা। তবে অভিনেতা ওমর শরিফের সঙ্গে মিল আছে চেহারার। মনে হয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক। দেখতে রীতিমত ভাল।'

'কিন্তু চোখ দুটো?'

'চোখ?' দ্বিধার মধ্যে পড়লেন আশরাফ। 'খেয়াল করিনি।

চোখে কী, আপা?'

'ঠিক জানি না। কী যেন আছে। বা থাকা উচিত, কিন্তু নেই।'

'ছবিটা হয়তো ভাল তুলতে পারেনি ফটোগ্রাফার।'

'হতে পারে।'

'আপা...' কী যেন বলতে গিয়েও থমকে গেলেন আশরাফ, চারপাশে জোরালো আওয়াজ শুরু হয়েছে। মনে হলো ধাতব কী যেন ছিঁড়ে পড়ছে। পরস্পরের দিকে চাইলেন তাঁরা। শত ঘণ্টার বেশি থেকেছেন বিমানে, দু'জনই বুঝলেন বড় কোনও সমস্যা হয়েছে। অজান্তে আটকে ফেলেছেন শ্বাস।

তারপর ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া বাড়তি কোনও শব্দ থাকল না।

ক' মুহূর্ত পর উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী, পাইলটের কাছে গিয়ে জানতে চাইবেন কী ঘটেছে। পাঁচ পা যেতে না যেতেই হঠাৎ ভীষণ দুলে উঠল বিমান, আকাশ থেকে খসে পড়তে লাগল। সিলিঙের দিকে উঠে গেলেন সালাম বিন আশরাফ, তারপর ধপ করে পড়লেন সিটে। দু'হাতে মোল্ডেড প্লাস্টিক ওভারহেড ধরে সামলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। পিছন থেকে চিৎকার শুনতে পেলেন। সবাই ওজন-শূন্য হয়ে যাওয়ায় চমকে গেছেন। কেউ কেউ পড়ছেন কলেমা।

'জানি না কী ঘটল,' ইণ্টারকমে বলে উঠলেন এয়ার ফোর্সের ক্যাপ্টেন, 'তবে দেরি না করে সবাই সিট বেল্ট বেঁধে নিন।' ইণ্টারকম খোলা রইল, আর এর ফলে শোনা গেল কো-পাইলট ও পাইলটের আলাপ। ঝরা পাতার মত খসে পড়ছে বিমান, নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছেন তাঁরা। 'কী বলছ! রেডিও নষ্ট? এই তো দু'মিনিট আগে ত্রিপোলির সঙ্গে কথা বললাম!'

'এর কোনও ব্যাখ্যা নেই,' বললেন কো-পাইলট। 'তবে রেডিও কাজ করছে না।'

'এখন এ নিয়ে ভাবলে চলবে না, আমাকে সাহায্য করো... ধুশ্‌শালা! পোর্ট ইঞ্জিন থেমে গেছে! আবার চালু করার চেষ্টা করো।' এরপর বন্ধ হয়ে গেল ইণ্টারকম।

'আমরা ক্র্যাশ করছি,' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আশরাফ। সিট ধরে ধরে চলে এলেন প্রধানমন্ত্রীর পাশে, চোখে ভীষণ দুশ্চিন্তা।

'আমরা পড়ে যাচ্ছি কি না জানি না,' শান্ত স্বরে বললেন প্রধানমন্ত্রী। টের পেলেন ঘামতে শুরু করেছে দু'হাতের তালু। 'তবে শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।'

'কিন্তু হলোটা কী?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইলেন এক এইড।

'জানি না। মনে হয় মেকানিকাল কিছু নষ্ট হয়েছে।' অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে। নীচের দিকে ধেয়ে চলেছে বিমান, অথচ এমন যাওয়ার কথা নয়। ঠিক ভাবে চলছে দুটো ইঞ্জিন। মাত্র একটি ইঞ্জিনই ওড়াতে পারে এসব বিমানকে। গোলমাল হয়েছে অন্য কোথাও, নইলে এভাবে নামত না বিমান। ধাতব আওয়াজটা কীসের ছিল? প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন, আঘাত হেনেছে কোনও মিসাইল, নষ্ট করে দিয়েছে কলকব্জা? এখনও তো চলছে বিমান।

এয়ারবাসের নেমে যাওয়ার গতি খানিক কমল, সোজা হলো মেঝে। বোধহয় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছেন ক্যাপ্টেন। তবে এখনও নেমে চলেছে প্লেন। এভাবে নীচে পড়লে কেউ বাঁচবে না।

সাবধানে যে যার সিটে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী ও এইড, বেঁধে নিলেন সিট বেল্ট। প্রধানমন্ত্রী নিচু কণ্ঠে সাহস দিলেন সবাইকে। একটু কাঁপছে তাঁর কণ্ঠ।

নীরবে কাঁদতে শুরু করেছেন দুই মহিলা এইড।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহাদয়,' শোনা গেল কো-পাইলটের কণ্ঠ: 'আমরা জানি না কী ঘটেছে। এইমাত্র থেমে গেছে একটা ইঞ্জিন। অন্যটাও যথেষ্ট শক্তি পাচ্ছে না। মরুভূমিতে নামতে হবে

আমাদের। তবে কেউ দুশ্চিন্তা করবেন না। আমাদের ক্যাপ্টেন আগেও ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং করেছেন, কোনও ভয় নেই। আমি বললেই ক্র্যাশ পজিশনে বসে পড়বেন। দুই হাঁটুর মাঝে রাখবেন মাথা। দুই হাত দিয়ে বেঁধে রাখবেন দুই হাঁটুকে। বিমান থেমে যাওয়ার পর স্টুয়ার্ডেস কেবিনের দরজা খুলে দেবে। সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল প্রথমে বিমান থেকে নামিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রীকে।'

বিমানে বিসিআইয়ের মাত্র একজন এজেন্ট। অন্যরা প্রধানমন্ত্রীর স্টাফ ও এইড। এজেন্টের নাম সাদাত হোসেন, নিজ সিট বেল্ট খুলে ফেলল যুবক। বিমানের ঝাঁকি কমে আসতেই চলে এল প্রধানমন্ত্রীর কাছে, পাশের সিটে বসে বেল্ট বেঁধে নিল। ঠিক তখনই আবার প্রবল ঝাঁকি খেল বিমান। পাথরের মত নীচে পড়ছে। একবার বালিতে নামলে প্রধানমন্ত্রীকে সিট থেকে তুলবে সাদাত হোসেন, নিয়ে যাবে দরজার কাছে। নামিয়ে দেবে বিমান থেকে। তাতে সময় লাগবে বড়জোর দশ সেকেণ্ড।

চুপচাপ বসে রইলেন প্রধানমন্ত্রী, নীরবে প্রার্থনা করছেন। নিজের বা কোনও নির্দিষ্ট মানুষের জন্য নয়। ভাবছেন সামনের কনফারেন্স যে সুযোগ এনে দিয়েছে, তা যেন গ্রহণ করে মানব-সভ্যতা। বোধহয় আর কখনও বিশ্বশান্তির জন্য এতবড় সুযোগ মিলবে না।

জানালা দিয়ে বাইরে চাইলেন তিনি। নীচে রুক্ষ মরুভূমি। এখানে ওখানে ছোরার মত টিলা-টক্করের চূড়া। তিনি পাইলট নন, তবে পরিষ্কার বুঝলেন কো-পাইলট যাই বলুক কোনও আশা নেই। আসল কথা: তাঁদের বাঁচবার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়।

'ঠিক আছে, আপনারা তৈরি হোন,' ঘোষণা দিল কো-পাইলট। 'আমরা নামতে শুরু করেছি। সবাই চলে যান ক্র্যাশ পজিশনে।'

যাত্রীরা শুনলেন পাইলট বলছেন: 'তুমি কি ওটা দেখেছ...'

তারপর বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারকমের স্পিকার। কেবিনে নেমে এসেছে নিচ্ছিদ্র নীরবতা। কেউ জানেন না কী দেখেছেন পাইলট। আর তা না জানাই বোধহয় সবার জন্য ভাল।

নয়

ড্রিল ট্রাকের প্যাসেঞ্জার সিটে বসেছে স্মৃতি, পাশে আসাদ চৌধুরি, গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলেছে। পুরনো নদী-খাতের মেঝে গোলাকৃতি পাথরে ভরা। কিছু সহজে নাড়ানো যায়, অন্যগুলো সরাতে চাইলে গায়ের জোর লাগে। এই এবড়োখেবড়ো পথে আসা-যাওয়া করতে গিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে পিঠের ত্বক ছিলে গেছে স্মৃতির।

গতরাতে ক্যাম্পে ফিরে তিউনিশিয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভের সঙ্গে আলাপ করেছে। লোকটার ধারণা, ওরা রোমান মিল ও ওয়াটার হুইল খুঁজছে। স্মৃতি জানিয়েছে, প্রতিরাতে ক্যাম্পে ফিরতে না হলে ভাল হয়। কয়েক দিনের জন্য মরুভূমিতে ক্যাম্প করতে চায়। সবুর রহমানের স্যাটালাইট ফোন দেখিয়ে বলেছে, দরকার পড়লে যে-কোনও সময়ে সে আর্কিওলজিকাল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

স্মৃতি ভাবছে, মূল আর্কিওলজিকাল টিম রোমান সাইটে ভাল কাজ দেখিয়েছে, কিন্তু ওরা নিজেরা কিছুই পায়নি। হয়তো কিছু পাবে, যদি ক' দিনের জন্য মরুভূমিতে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বড় এলাকা নিয়ে খুঁজতে পারবে। বলা যায় না, হয়তো খুঁজে

পাবে পুরনো বারবারি দস্যু ইউনুস আল-কবিরের আখড়া।

বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিউনিশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ মানা করে দিচ্ছে দেখে লোকটাকে একটু দূরে নিয়ে গেছে সবুর রহমান, দু'মিনিট কী যেন বলেছে। এরপর যখন ডাইনিং টেন্টে ফিরল দু'জন, তখন লোকটার চোখদুটো চকচক করছিল। খুশি মনে বলল, স্মৃতি চাইলে মরুভূমিতে এক বছর থাকতে পারে। শর্ত মাত্র একটা, প্রতি তিনদিন পর একবার করে ক্যাম্পে ফিরতে হবে।

লোকটা বিদায় নেয়ার পর সবুরকে ধরল স্মৃতি।

সে নির্বিকার মুখে বলল, 'সব কিছু নির্ভর করে বকশিসের উপর।'

'কিন্তু লোকটা যদি ঘুষ না নিতে চাইত?' জানতে চেয়েছে স্মৃতি। 'যদি কর্তৃপক্ষকে জানাত?'

'কী যে বলেন, এটা মধ্যপ্রাচ্য। এখানে টাকার ক্ষমতা সার্বজাতিক। ঘুষ এখানে জায়েজ।'

'কিন্তু...' আর কিছু বলতে পারেনি স্মৃতি। নিজে কখনও ঘুষ দেয়নি। জীবন কেটেছে নিয়ম মেনে। কখনও কোনও পরীক্ষায় নকল করেনি। নিয়মিত আয়কর দিয়েছে। গাড়ির স্পিড মিটার মেনে চলেছে। কখনও আইনের বাইরে যায়নি। ফলে পরিষ্কার থেকেছে মন। কখনও মেনে নেবে না দুনিয়া জুড়ে চলছে ভয়ঙ্কর সব দুর্নীতি। কিন্তু গত রাতে নিজের কাছে হেরে গেছে। একটা বাড়তি সুযোগ পেয়ে তা হারাতে চায়নি।

আজও রওনা হয়েছে নদী-খাতের দিকে। আগামী তিন দিন পর ক্যাম্পে ফিরলেই চলবে। ঠিক হয়েছে, জলপ্রপাতের ওপাশে কী আছে তা জানতে হবে। হয়তো ওদিকেই ছিল ইউনুস আল-কবিরের আস্তানা, ঢেউ খেলানো টিলা ও বালির ঢিবির ভিতর।

ট্রাকে পর্যাপ্ত পানি ও খাবার নিয়েছে ওরা। তাতে চলবে চার

দিন। সঙ্গে এনেছে মাত্র একটা তাঁবু। ঠিক হয়েছে পুরুষ সঙ্গীরা ট্রাকে ঘুমাবে, আর তাঁবু থাকবে স্মৃতির জন্য। ট্রাকে তোলা হয়েছে পঞ্চাশ গ্যালনের ডিজেল ড্রাম। ওটার কারণে তিন শ' মাইল চলবে ট্রাক। অবশ্য ড্রিল বেশি ব্যবহার না করলে, তবেই।

এই ছোট্ট দলের কেউ আশাবাদী নয়। ওই জলপ্রপাত বেশ উঁচু, টপকে যেতে পারবে না কোনও জাহাজ। তবু একবার অন্তত ওদিকটা ভাল করে দেখতে হবে। আর করবেই বা কী? ঘনিয়ে এসেছে শান্তি মহাসম্মেলন। সবুর ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল, তখন স্মৃতি জেনেছে, আজই নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সবার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরে নেবেন তিনি। কোণঠাসা বোধ করছে স্মৃতি। বারবার মনে হচ্ছে, নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

'আরে ভাই, বারবার গর্তে ফেলতে হবে চাকা?' অধৈর্য হয়ে বলে উঠল সবুর। পিছনের বেঞ্চ সিটে বসেছে সে।

'আপনি চালালেও এ-ই হয়,' বলল গম্ভীর আসাদ।

আজ ঝকমকে একটা দিন। দুপুরের দিকে তাপমাত্রা হলো এক শ' আশি ডিগ্রি। কুলার থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করল স্মৃতি, দুই সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিল। এবার দিল ক্যাম্প থেকে আনা স্যাণ্ডউইচ। ওডোমিটার বলছে সত্তর মাইল পেরিয়েছে। তার মানে আর ত্রিশ মাইল গেলে জলপ্রপাত।

'ওদিকটা দেখে কী মনে হয়?' জানতে চাইল আসাদ চৌধুরি। চিবিয়ে চলেছে স্যাণ্ডউইচ। বাকি অংশ তাক করল একদিকে। বেশির ভাগ সময় নদী চলেছে খাড়া টিলার মাঝ দিয়ে। কিন্তু সামনে বাঁক নিয়েছে। একদিকে ঢালু পাড় গিয়ে উঠেছে মরুভূমির মেঝেতে।

'ষাট পার্সেন্ট ঢাল, বা আরও খাড়া,' বলল সবুর।

'যদি উপরে বড় পাথর পাই, তার সঙ্গে ট্রাক বেঁধে মরুভূমিতে

উঠতে পারব।'

'ভাবতে ভালই তো লাগছে,' বলল স্মৃতি।

খাবার শেষে ঝিমানি ধরল তিনজনের দলটিকে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি। ট্রাক নিয়ে নদীর এক ধারে থামল আসাদ। সাবধানে দেখল সামনের পাড়। দূর থেকে অনেক কম ঢালু মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রীতিমত পাহাড়। বেয়ে উঠতে হলে কমপক্ষে ত্রিশ ফুট পেরুতে হবে। ট্রাক নিয়ে রওনা হয়ে গেল আসাদ, খানিক উঠবার পর পিছলাতে লাগল পিছনের চাকা। ছিটকে পিছনে পড়ছে পাথর ও বালি। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল স্মৃতি ও সবুর। ট্রাকের বাম্পারের সঙ্গে লাগানো উইঞ্চের সামনে থামল ওরা। উইঞ্চ থেকে স্টিলের কেবল নিল স্মৃতি। দলের ভিতর সবচেয়ে শক্তপোক্ত সবুর, সে কেব্‌ল্ নিয়ে উঠতে লাগল। বুট জুতোর পিছন থেকে শুরু হলো ছোটখাটো অ্যাভালাঞ্চ। প্রতি পদক্ষেপে ঝুরঝুর করে পড়ছে নুড়ি পাথর ও বালি। দশ ফুট উঠতে না উঠতেই চার হাত-পা ব্যবহার করতে হলো। দমকা বাতাসে মাথা থেকে উড়িয়ে নিল শনের হ্যাট, নীচে গিয়ে পড়ল ওটা। বিড়বিড় করে কপালকে অভিশাপ দিল সবুর। বেল্টের পিছন অংশে আটকে নিল কেবলের হুক। পাথর খামচে ধরে উঠতে হচ্ছে। দুই হাতের নখ জ্বলছে।

দশ মিনিট লাগল সবুরের মরুভূমির প্রান্তে উঠতে। ততক্ষণে দরদর করে ঘামছে। ভিজে গেছে শার্টের পিঠ। পাড় থেকে সরে গেল সে, আর দেখা যাচ্ছে না। পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে কেবল।

তিন মিনিট পর আবারও দেখা দিল। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'বড় একটা পাথরের সঙ্গে আটকে দিয়েছি কেবল। আসাদ, চেষ্টা করে দেখুন। এবার বোধহয় উঠে আসবে ট্রাক।'

ক্যাবের ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় উইঞ্চ। সবুরের হ্যাট

কুড়িয়ে নিল স্মৃতি, উঠে বসল প্যাসেঞ্জার সিটে। গিয়ার ফেলল আসাদ, চাপ দিল অ্যাক্সেলারেটারে। সেইসঙ্গে চালু করল উইঞ্চের টগল। খুব শক্তিশালী নয় উইঞ্চের মোটর, তবে তিনটি গিয়ার দেয়ার পর উঠতে লাগল। রাজকীয় ভঙ্গি নিয়ে ধীরে উঠছে ট্রাক। পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল আসাদ ও স্মৃতি। উপর থেকে বিজয়ের চিৎকার দিল সবুর। ওরা জিতছে।

মুখের উপর কীসের ছায়া পড়তে উপরের দিকে চাইল স্মৃতি। ধারণা করেছে, ওটা শকুন বা বাজপাখি।

কিন্তু বিদঘুটে শোঁ-শোঁ আওয়াজ কীসের?

চমকে গেল স্মৃতি। মাত্র এক হাজার ফুট উপর দিয়ে পেরুল প্রকাণ্ড বিমান। আওয়াজ নেই, ইঞ্জিনগুলোকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। চিলের মত গ্লাইড করছে।

কিন্তু বিমান এখানে কেন?

স্মৃতি জানে, আশপাশে তিউনিশিয়ার কোনও এয়ারপোর্ট বা রানওয়ে নেই। থাকলে থাকতে পারে লিবিয়া সীমান্তের ওদিকে।

ওর মন বলে দিল, মস্ত বিপদে পড়েছে ওই বিমান।

নিঃশব্দে ভেসে চলেছে বিমান। দুটো বিষয় লক্ষ্য করল স্মৃতি। বিমানের লেজে গোল একটা গর্ত। ওখান থেকে ঝরে পড়ছে হাইড্রলিক ফ্লুইড। তার চেয়ে বড় কথা, বিমানের ফিউজেলাজে বড় করে লেখা: *বাংলাদেশ বিমান*।

হৈ-চৈ থামিয়ে দিয়েছে সবুর রহমান। কপালের উপর হাত রেখে দেখছে আকাশ। দূর থেকে দূরে সরছে বিমান। দ্রুত নেমে আসছে মরুভূমি ও টিলার দিকে!

হাঁ হয়ে গেল স্মৃতি। টের পেয়েছে ওই বিমানে কে থাকতে পারেন!

পাথুরে মরুভূমিতে উঠবার জন্য পুরো মনোযোগ দিয়েছে আসাদ চৌধুরি। কিছুই দেখতে পায়নি। স্মৃতি কাতরে ওঠায়

ভাবল টো কেবলে সমস্যা। 'কী হয়েছে বলুন তো?'

'যত দ্রুত সম্ভব উঠুন।'

'সে চেষ্টাই তো করছি। কিন্তু অত তাড়াহুড়ো কীসের?'

'এইমাত্র যে বিমান পেরিয়ে গেল, ওটা বাংলাদেশ বিমানের। ওটার ভিতর রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী!'

কিন্তু কিছুই করবার নেই আসাদের। উইঞ্চটা খুব ধীরে কেবল টেনে উপরে তুলছে ট্রাককে।

সবুরের দিকে চেয়ে জানতে চাইল স্মৃতি, 'কিছু দেখছেন?'

'না,' রিগের মোটরের উপর দিয়ে বলল সবুর। 'কয়েকটা টিলার ওপাশে চলে গেছে। জায়গাটা এখান থেকে কয়েক মাইল হবে। কোনও ধোঁয়া দেখছি না। বোধহয় নিরাপদে নামতে পেরেছে।'

পরের এগারো মিনিট বড় ধীরে কাটল, মরুভূমির দিকে উঠে এল ট্রাক। বার কয়েক তথ্য দিল সবুর, চারপাশে কোনও ধোঁয়া নেই।

এটা একটা বড় সান্ত্বনা।

শুকনো নদী থেকে মরুভূমির মেঝেতে উঠে এল ট্রাক। টো হুক খুলে নিল সবুর। গুটিয়ে নিতে চাইল কেবল। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মত প্রকাণ্ড এক পাথরে বেঁধেছে কেবল। নরম পাথরে গেঁথে গেছে ওটা। পাথরে পা ঠেকিয়ে গায়ের জোরে কেবল বের করে নিতে হলো।

'বিমানটা বোধহয় লিবিয়ায় নেমেছে,' বিড়বিড় করে বলল আসাদ।

'কী বললেন?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'বলছি বিমান নেমেছে লিবিয়ার জমিতে,' এবার স্বাভাবিক স্বরে বলল সে।

স্মৃতি দলের নেত্রী, কিন্তু চাইল সবুরের দিকে। ওর ধারণা

হয়েছে সবুর রহমান এনএসআই বা এ ধরনের কোনও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। সে হয়তো বলবে এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত।

'এমন হতে পারে পঞ্চাশ মাইলের ভিতর আমরা একমাত্র মানুষ,' বলল সবুর। 'বিমান যদি নেমে থাকে, হয়তো ওখানে অনেকে আহত হয়েছে। আমাদের উচিত ট্রাক নিয়ে যাওয়া।'

'কাদের হয়ে কাজ করেন আপনি?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'আমরা সময় নষ্ট করছি।'

'সবুর, ব্যাপারটা জরুরি। যদি লিবিয়ার সীমান্তের ওপাশে যাই, তার আগে জানতে চাই আপনি কী ধরনের কাজ করেন।'

'আমি সরকারী সংস্থার সঙ্গে আছি। ওটার নাম আপনি শোনেননি। বিসিআই। আমার কাজ আপনাদের উপর চোখ রাখা। ডক্টর ব্রাম ট্যাগার্ট তো ক্যাম্প থেকে বের হন না, কাজেই আমি আপনাদের দু'জনের উপর চোখ রাখছিলাম। স্মৃতি, আপনি তো ওই বিমান দেখেছেন?' আস্তে করে মাথা দোলাল আর্কিওলজিস্ট। 'আপনি কি জানেন ওই বিমানে কে রয়েছেন?'

'হ্যাঁ, বোধহয় জানি।'

'আপনি বা আসাদ নিশ্চয়ই চাইবেন না উনি মারা যান? আমাদের দায়িত্ব তাঁকে উদ্ধার করা। এখন ভয় পেলে চলবে না। দরকার পড়লে লিবিয়ান বর্ডার বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করব। লিবিয়ার সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আশা করি সরকার আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না।'

আসাদ চৌধুরির দিকে চাইল স্মৃতি। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। নির্বিকার দাঁড়িয়ে রয়েছে যুবক। 'আপনার কী মনে হয়?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'আমি নায়ক নই, তবে মনে হয় গিয়ে দেখা উচিত।'

'তা হলে চলুন,' তাড়া দিল স্মৃতি।

খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে এল ট্রাক। চাঁদের মাটির মত

ফাটল ধরা জমিন। কোথাও কোনও গাছ নেই। শুষ্ক প্রান্তর। কিছু দূর যাওয়ার পর শুরু হলো টিলাময় অঞ্চল। চারপাশে বড় বড় বোল্ডার। মরুভূমির এই গভীর অংশে টিকে থাকে শুধু গিরগিটি ও পোকা-মাকড়। সন্ধ্যা নেমে এলে শিকারে বের হয়।

ট্রাক চলেছে। সবুর রহমান স্যাটালাইট ফোনে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। খানিক পর টের পেল তার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। ন্যাপস্যাক থেকে বের করল আরেকটা রিচার্জেবল ব্যাটারি, কিন্তু ওটা ঠিক থাকলেও বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না সান স্পটের কারণে।

'শুনুন, এটা প্রায়োরিটি মিশন,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল সে। 'আমরা যদি ইউনুস আল-কবিরের ফতোয়া আবিষ্কার করতে পারি, খুব ভাল। কিন্তু যদি না পারি, তা-ও চলবে কনফারেন্স।'

'তাই ধারণা করছি,' বলল আসাদ চৌধুরি।

'কিন্তু কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ বক্তাদের একজন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে ঠিক চলবে না কিছুই।'

সবুরের কথাগুলো মিলিয়ে গেল, চুপ করে থাকল স্মৃতি ও আসাদ। থমথম করছে পরিবেশ। খ্যারর-খ্যারর আওয়াজে চলছে ডিজেল ট্রাক। সবাই ভাবছে: বিমান যেখানে নেমেছে, সেখানে পৌঁছে কী দেখবে? ভয়ঙ্কর কোনও দৃশ্য? কখনও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি ওদের। তবে শুনেছে, ভদ্রমহিলা মুহূর্তে সবাইকে আপন করে নেন। উনি নানা দেশে শান্তি বজায় রাখবার জন্য বহুবার বক্তব্য দিয়েছেন জাতি-সংঘে। বলতে গেলে তাঁর উদ্যোগেই সংঘটিত হচ্ছে শান্তি মহাসম্মেলন। দিনের পর দিন কাজ করেছেন দেশগুলোর প্রধানদের একত্রিত করতে। ...উন্নত দেশের তৈরি গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গরীব দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সংগঠিত করেছেন। উন্নয়নশীল

দেশের সমস্যা তুলে ধরেছেন সবার কাছে। ...ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। এক কথায় বললে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এমনই একজন নেত্রী দরকার ছিল। আর এ মানুষটি বিমান ক্র্যাশে হারিয়ে গেলে তা সবার জন্য মস্ত ক্ষতি।

টিলার ভিতর এঁকেবেঁকে গেছে এক ক্যানিয়ন। ওটা ধরে চলল ট্রাক। এখানে খোলা মরুভূমির চেয়ে তাপমাত্রা একটু কম। সাপের মত পেঁচিয়ে সামনে বেড়েছে ক্যানিয়ন, তারপর বেরিয়ে এল ওরা উল্টো মুখে। এখন পর্যন্ত বিমানটার দেখা নেই। কোথায় ক্র্যাশ করেছে বোঝা গেল না। আকাশে কোথাও ধোঁয়ার আভাস নেই। যত নীচ দিয়ে গেছে বিমান, তাতে ধারণা করা যায় এতক্ষণে মাটিতে নেমে পড়েছে।

মনে মনে প্রার্থনা করল স্মৃতি, নিরাপদে থাকুন মানুষগুলো।

আরও একঘণ্টা এগোলো ট্রাক। ওরা সবাই জানে অনেক আগেই লিবিয়া সীমান্ত পেরিয়েছে, এখন ওরা সম্পূর্ণ বেআইনী অনুপ্রবেশকারী। স্মৃতি ও আসাদের ভরসা সবুর, সে ভাল আরবি জানে। কোনও বর্ডার প্যাট্রল টিমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে হয়তো নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে।

বারবার উঁচু-নিচু হচ্ছে মরুভূমির মেঝে। নুড়ি পাথরের ঢিবির পর ঢিবি। সেখান থেকে আসছে প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহ। দূরে চাইলে মনে হয় থরথর করে কাঁপছে সব। আরেকটা ঢিবির উপর উঠল ট্রাক। উল্টোদিকে নামতে শুরু করেছে আসাদ, এমন সময় হঠাৎ ব্রেক কষল। দ্রুত ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছন দিক দেখে নিল, ট্রাক পিছিয়ে নিতে চাইছে।

'কী হলো?' ভড়কে গেল স্মৃতি। ঢাল বেয়ে পিছন দিকে নামতে চাইছে ট্রাক।

আসাদের বদলে জবাব দিল সবুর, 'লিবিয়ান প্যাট্রল!'

টিবির উপর উঠে এসেছে মিলিটারি ভেহিকেল। উপরের হ্যাচ থেকে মাথা তুলেছে এক সৈনিক, হাতে ভয়ঙ্কর দর্শন মেশিনগান। গাড়ির সাসপেনশন উঁচু, টায়ারগুলো বেলুনের মত ফোলানো। বাক্সের মত ক্যাব। গাড়িটা মরুভূমিতে চলার জন্য তৈরি।

'ভুলেও পিছাবেন না, আসাদ,' ইঞ্জিনের শব্দের উপর দিয়ে বলল সবুর, 'সে চেষ্টা করলে ওরা গুলি করবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধার ভিতর পড়ল আসাদ, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। ঠিকই বলেছে সবুর। অ্যাক্সেলারেটার থেকে পা সরিয়ে নিল সে, চেপে ধরল ব্রেক। একটু হড়কে গিয়ে থামল ট্রাক। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

লিবিয়ান ট্রাক বিশ গজ দূরে থেমেছে। ছাতের গানার পরিষ্কার দেখছে তিনজনকে। পিছন-দরজা খুলে লাফিয়ে নামল চার সৈনিক, পরনে মরুভূমির ফেটিগ। একে-ফোরটিসেভেন বাগিয়ে ধরে ছুটে আসছে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে।

জীবনে এত ভয় পায়নি স্মৃতি। সব যেন ঘুমের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত আগে ওরা নিশ্চিন্ত মনে একা চলছিল, আর পরমুহূর্তে অস্ত্র হাতে ধেয়ে এল সৈনিক। চারটে রাইফেল তাক করে আছে ওদের দিকে!

চিৎকার করে কী যেন বলছে লিবিয়ান সৈনিকরা, সঙ্গে হাতের ইশারা। বোধহয় ট্রাক থেকে নামতে বলছে। আরবি ভাষায় তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়তে চাইল সবুর। কিন্তু লোকগুলো শুনতে রাজি নয়। এক সৈনিক পিছিয়ে গেল, এক পশলা গুলি ছুঁড়ল ট্রাকের পাশে। ছিটকে উঠল বালি ও পাথর। বাতাসে ভেসে গেল বালিকণা। পাথরগুলো ছিটিয়ে গেল চারদিকে।

প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল স্মৃতি, নিজেও জানে না কখন কাঁদতে শুরু করেছে।

ওরা তিনজন মাথার উপর দু'হাত তুলল। বোঝাতে চাইছে

আত্মসমর্পণ করছে। এক সৈনিক খপ করে ধরল স্মৃতির হাত, হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিল ক্যাব থেকে। এই দুর্ব্যবহার দেখে আপত্তি তুলতে চাইল আসাদ, কিন্তু পাশ থেকে তার কাঁধের উপর নামল একে-৪৭-এর বাঁট। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে শুরু করে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল ওর, বিকৃত হয়ে গেল মুখ।

টান খেয়ে বালির উপর আছড়ে পড়ল স্মৃতি। ব্যথা তো আছেই, তার চেয়ে বেশি লাগল মনে। এত অপমান কী করে সইবে?

পিছন সিট থেকে লাফিয়ে নামল সবুর, দু'হাত মাথার উপর তুলে রেখেছে। 'দয়া করে শুনুন,' আরবিতে বলল। 'আমরা জানতাম না লিবিয়ার ভিতর ঢুকে পড়েছি।'

'বিমানটার কথা বলুন,' বলল স্মৃতি। উঠে দাঁড়াল। পোশাক থেকে ঝাড়তে শুরু করেছে বালি।

'ঠিক আছে, বলছি,' সৈনিকদের দিকে চাইল সবুর। 'আমরা একটা বিমান দেখতে পাই। ওটা ক্র্যাশ করছিল। তাই কী হয়েছে দেখতে আসি।'

সৈনিকদের পোশাকে কোনও ইনসিগনিয়া নেই। তবে মনে হলো একজন এদের নেতা। লোকটা জানতে চাইল, 'এসব কোথা থেকে দেখেছ?'

কথা বলবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো সবুর। 'আমরা একটা আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনে এসেছি। তিউনিশিয়ার ভিতর সীমান্তের পাশেই ক্যাম্প। কাজ করছিলাম, এমন সময় দেখি মাত্র এক হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেল বিমানটা। অর্থাৎ, ধরুন, তিন শ' মিটার উপর দিয়ে।'

'তোমরা প্লেন ক্র্যাশ করতে দেখেছ?' সৈনিকদের নেতার গালে চাপ দাড়ি।

'না। দেখিনি। ধারণা করেছি যে-ভাবেই হোক, মরুভূমিতে

নেমে গেছে। কোনও ধোঁয়া দেখিনি।'

'এটা তোমাদের জন্য একটা ভাল সংবাদ,' নির্বিকার সুরে বলল লোকটা।

'কী বলতে চাইছেন?' নরম স্বরে জানতে চাইল সবুর।

পাত্তা দিল না লিবিয়ান, ঘুরে চলে গেল প্যাট্রল ভেহিকেলে। এক মিনিট পর ফিরে এল। বাঙালিরা বুঝতে পারল না তার হাতে কী। তারপর এক সৈনিকের হাতে দেয়া হলো। জিনিসগুলো হ্যাণ্ডকাফ!

'আমাদের আটক করছেন কেন?' ইংরেজিতে বলল স্মৃতি। কিন্তু এক সৈনিক পিছন থেকে খপ্ করে ওর কাঁধ ধরল। 'আমরা তো কোনও অপরাধ করিনি!'

ওর দুই কবজি আটকা পড়ল হ্যাণ্ডকাফে। অপমানে লাল হয়ে গেল স্মৃতি, থুতু ছুঁড়ল লোকটার মুখ লক্ষ্য করে। ঠিক লেগেছে! এতে ভীষণ রেগে গেল লিবিয়ান, উল্টো হাতে প্রচণ্ড এক চড় দিল স্মৃতির গালে। বেচারি হোঁচট খেয়ে পড়ল বালির উপর।

ধাক্কা দিয়ে সামনের সৈনিককে সরিয়ে দিল আসাদ, লোকটা হ্যাণ্ডকাফ পরাতে চাইছে ওর হাতে, কিন্তু পাত্তাই দিল না। দু' পা সামনে বাড়ল স্মৃতিকে তুলতে, বালির উপর প্রায় অচেতন মেয়েটি। ঠিক তখনই নড়ে উঠল সৈনিকদের নেতা। ওয়েইস্ট হোলস্টার থেকে ছোঁ মেরে বের করে ফেলেছে পিস্তল, পরক্ষণে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করল আসাদের ডান চোখ লক্ষ্য করে।

ছিটকে পিছনে গেল আসাদের মাথা, স্মৃতির কয়েক ফুট দূরে ধপ্ করে পড়ল লাশ। বিবশ হয়ে চেয়ে রইল স্মৃতি, আসাদের কপালে তৈরি হয়েছে রক্তাক্ত আরেকটা চোখ! ওখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঘন লাল রঙের ধারা।

স্মৃতি টের পেল, উঠে দাঁড়িয়েছে। কোনও বোধ কাজ করছে না। কাউকে বাধা দিল না, ওকে টেনে নিয়ে চলেছে দুই সৈনিক,

তুলে দিল ট্রাকে।

দরদর করে অশ্রু ঝরছে স্মৃতির দুই গাল বেয়ে।

থমকে গেছে সবুর রহমান। নীরবে স্মৃতির পাশে গিয়ে বসল। ট্রাকের ভিতরটা ভ্যাপসা গরম। খোলা মরুভূমি এর চেয়ে অনেক শীতল ছিল।

এক সৈনিক কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল ওদের দু'জনকে।

দশ

বাংলাদেশ এম্বেসি। ত্রিপোলি।

নিজ অফিসে বসে আছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল। তাঁর সেক্রেটারি ঘরের দরজা খুলে দিতেই সচেতন হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দামি কার্পেট মাড়িয়ে চললেন দরজার দিকে। ঘরের মাঝ পর্যন্ত চলে এলেন।

অফিসে ঢুকেছেন লিবিয়ান ফরেন মিনিস্টার, মোহাম্মদ ফতে আলী।

'আসুন, মাননীয় মন্ত্রী, জরুরি শিডিউল রেখে এসেছেন বলে আন্তরিক ধন্যবাদ,' থমথম করছে অ্যাম্বাসেডারের মুখ।

'গুরুতর এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি চেয়েছেন আমাদের সরকারের তরফ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে সমবেদনা জানাতে। সত্যিই, দেশের কাজ ফেলে রাখা কঠিন। তবে নিশ্চয়ই আমার উপস্থিতি থেকে বুঝছেন, এই দুঃখজনক দুর্ঘটনায় আমরা সত্যি গভীর সমবেদনা জানাতে চাই?' অ্যাম্বাসেডারের দিকে হাত

বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন নাহিদ কামাল। হাতটা ছেড়ে দিলেন না, নিয়ে চললেন ভদ্রলোককে সোফার দিকে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল ঝিকমিকে নীল ভূমধ্যসাগর। বহু দূরে পশ্চিমে চলেছে এক সুপার ট্যাঙ্কার।

বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডার মাঝারি আকৃতির মানুষ। তাঁর পাশে ঝাড়া ছ' ফুটি লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেন রীতিমত পাহাড়। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো তাঁর। পরনে স্যাভিল রো-র দামি সুট। আয়নার মত ঝিকঝিক করছে শু জোড়া। নিখুঁত ইংরেজি বলেন। প্রায় ধরাই যায় না তিনি আরব। মুখোমুখি সোফায় বসে বাম উরুর উপর ডান উরু রাখলেন, ঠিক করে নিলেন সুটের প্যাণ্টের ভাঁজ।

'আমাদের সরকারের তরফ থেকে বলতে পারি, ইতিমধ্যে ওই এলাকায় তল্লাশী ও উদ্ধারের জন্য তিনটি দল পাঠানো হয়েছে। পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে রিকনেসেন্স বিমান। ওই বিমানের কী ঘটেছে তা জেনে যাব আমরা শীঘ্রিই, তার আগে ক্ষান্ত দেব না।'

'সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ, মাননীয় মন্ত্রী।' আনুষ্ঠানিক ভাবে বললেন অ্যাম্বাসেডার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কূটনীতিক, তাঁর জানা আছে শুধু মূল বক্তব্য শুনলে চলবে না; তা কী সুরে কীভাবে বলা হলো, তা বুঝতে হবে। 'এই পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার কোনও সাহায্যে আসতে পারে? আপনি উপস্থিত হওয়ায় ধারণা করছি লিবিয়ান সরকার ভাবছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনার ভিতর পড়েছেন।'

'বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে থেকেই আমাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না,' বললেন লিবিয়ান মন্ত্রী। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'এ ছিল দু' দেশের মানুষের জন্য দুঃখজনক। আপনারা স্বাধীনতা পাওয়ার পরও আমাদের ভিতর সম্পর্ক বিরূপ ছিল। তবে পরে আলাপের

মাধ্যমে বিরোধগুলো নিষ্পত্তি হয়। এ দেশে হাজারো বাংলাদেশি লোক চাকরি নিয়ে আসে। হয়তো এ থেকে প্রমাণ হয় আমরা আপনাদের বন্ধু রাষ্ট্র। আপনি তো জানেন আমরা চেয়েছি শান্তি মহাসম্মেলন আমাদের দেশে আয়োজিত হোক। সেজন্য আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে একই সাথে কাজ করে গেছেন।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন অ্যাম্বাসেডার। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মাননীয় মন্ত্রী। আমরা চাই জগতে শান্তি ফিরে আসুক।' নড়েচড়ে বসলেন তিনি। 'এবার ফিরি বিমান দুর্ঘটনা বিষয়ে। আমাদের সরকার থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ওই বিমানে কোনও সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। তবে আপনাদের পাশাপাশি আমরা নিজেরাও তদন্ত করে দেখতে চাই।' কামাল সাহেব বুঝতে পারছেন জবাব কী হতে পারে। 'আপনারা অনুমতি দিলে আমাদের তদন্ত দল এ দেশে আসতে পারে।'

'খুবই খুশি হতাম, যদি অনুমতি দেয়া যেত,' বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। 'তবে লিবিয়ান সরকারের ধারণা আমাদের নিজস্ব মিলিটারি এবং সিভিলিয়ান সার্চ ইউনিটগুলো এ কাজে যথেষ্ট পারঙ্গম।'

থম মেরে রইলেন অ্যাম্বাসেডার।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন মোহাম্মদ ফতে আলী। 'আমরা সত্যিই দুঃখিত। তবে ভাববেন না। আমাদের ইউনিটগুলো ওই বিমান খুঁজে বের করবে। ...এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। কনফারেন্সের বিষয়ে প্রতিটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা। আমাদের অনুরোধে সবাই জানিয়েছে, এই দুঃখজনক দুর্ঘটনার পরও তাঁরা পীস সামিটে যোগ দেবেন। আপনারা কী ভাবছেন?'

'আজ সকালে আমাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' বললেন নাহিদ কামাল। 'তিনিও ওই একই কথা বলেছেন।

আমরা পীস সামিটে যোগ দেব। খোদা মাফ করুন, সত্যিই যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর খারাপ কিছু ঘটে থাকে, তারপরও আমরা বলব, তিনি নিজেও চাইতেন এই মহাসম্মেলন সফল হোক। আগে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠার এত বড় সুযোগ আসেনি। হয়তো ভবিষ্যতেও আসবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বোধহয় অন্য সবার চেয়ে বেশিই চেয়েছেন শান্তি সম্মেলন।'

'ভাল বলেছেন। খারাপ কিছু না হোক। তবুও বলতে হয় তা-ই বলছি তিনি সম্মেলনে যোগ না দিতে পারলে সেক্ষেত্রে আপনাদের সরকারের তরফ থেকে কে আসছেন?'

'এখনও জানি না। আমাদের সরকার এই মুহূর্তে বিমূঢ়।'

'বুঝতে পারছি। খবরের কাগজে যা পড়েছি, সত্যিই আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর কোনও রিপ্লেসমেন্ট নেই।' কাঁধ ঝাঁকালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। 'মিস্টার অ্যাম্বাসেডার, আপনার বাড়তি সময় নেব না। অন্তর থেকে বলছি, এ ঘটনায় আমি দুঃখিত। কথা দিতে পারি, যে মুহূর্তে কোনও খবর পাব, তা দিন হোক বা রাত, আমি নিজে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'জানি না কেন এ ধরনের খেলা খেলেন আল্লাহ।'

'ধন্যবাদ,' আর কিছু বললেন না কামাল। পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিজে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে আসতে বললেন, 'মিস্টার মিনিস্টার, একটা কথা। যদি ওখানে কোনও ধ্বংসাবশেষ থাকে, আমাদের কর্তব্য কী হবে?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'বিমান যদি ভূ-পাতিত হয়, বাংলাদেশ সরকার অনুরোধ করবে আমাদের নিজেদের গবেষক টিম যেন ওখানে যেতে পারে। তারা খুঁজে বের করবে কী কারণে বিমান পতিত হয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ, বুঝেছি।' চোয়াল ঘষলেন আলী। 'ওই একই কাজ

করবার জন্য আমাদের গবেষক দল রয়েছে। তবে কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে করি না। তারপরও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথাটা নিয়ে আলাপ করে তাঁর মতামতটা পরে জানিয়ে দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

দু'মিনিট পর নিজের অফিসে ফিরলেন নাহিদ কামাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টোকা পড়ল দরজায়।

'কাম ইন।'

'আপনার কী মনে হলো?' জানতে চাইল বিসিআইয়ের সলীল সেন। গদিমোড়া সোফায় বসল রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। আট ঘণ্টা আগে পৌঁচেছে সে এ-দেশে। বিসিআইয়ের তুখোড় স্পাই ছিল সে, শারীরিক কিছু অসুবিধার জন্য বর্তমানে ডেস্কে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিল। ডেস্ক ওঅর্কের জন্য ওকে আবারও বিসিআই-এ ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

'এরা যদি কিছু করেও থাকে, মোহাম্মদ ফতে আলী সেসবের সঙ্গে জড়িত না,' বললেন কামাল।

'যা শুনেছি, এই লোক গাদ্দাফির প্রিয় পাত্র। বিমান যদি পড়ে গিয়ে থাকে, ফতে আলি তা জানে।'

'আমার মন বলছে লিবিয়ানরা কিছুই করেনি। যা ঘটেছে সেটা নেহায়েতই দুর্ঘটনা।'

'আমরা এখনও নিশ্চিত নই। ধ্বংসাবশেষ পেলে আমাদের তদন্ত দল বলতে পারবে কী ঘটেছে।'

'তা তো বটেই।'

'মোহাম্মদ ফতে আলীর কাছে জানতে চেয়েছেন আমাদের ছেলেদের আসতে দেবে কি না?'

'জানতে চেয়েছি। মনে হলো আপত্তি নেই। তবে আগে গাদ্দাফির সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে। বুঝলাম দ্বিতীয়বার এ কথা শুনবার জন্য তৈরি ছিল না। জবাব দিতে সময় নিয়েছে।

তবে কূটনৈতিক ভাবে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না তার।'

'আমাদের নিজেদের লোক ঠিকই বুঝবে কী হয়েছে,' বলল সলীল। 'কী ধরনের লোক মোহাম্মদ ফতে আলী?'

'আগেও দেখা হয়েছে। তবে এই প্রথম মনে হলো কূটনৈতিক ভদ্রতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক, আচরণ অত্যন্ত ভদ্র। তবে খানিক বিচলিত মনে হলো। গভীর ভাবে জড়িয়ে আছে শান্তি মহাসম্মেলনের সঙ্গে। যেন ওটা সফল হওয়ার উপর নির্ভর করছে তার ব্যক্তিগত সম্মান। টপ সামিটের আগেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। খুব বিব্রত মনে হলো। বিশ্বাস হয় না গাদ্দাফির মত লোকের সরকারে এ ধরনের ভদ্রলোক থাকবে।'

'গাদ্দাফি ভাল করেই বুঝছেন সব। আমেরিকা দখল করে নিয়েছে ইরাক। মারা গেছেন সাদ্দাম হোসেন। বোধহয় এর পর তাঁর নিজের উপর হামলা আসবে। তাই শান্তি সম্মেলনের ব্যাপারে তাঁর এই আগ্রহ।'

'সত্যিই আর বেশি দিন নেই, পশ্চিমারা লেলিয়ে দেবে সরকার-বিরোধীদের।' প্রসঙ্গ পাল্টালেন কামাল, 'নতুন কোনও তথ্য পেলেন?'

'আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি আমেরিকার ন্যাশনাল রিকনেসেন্স অফিস তাদের এক স্পাই স্যাটালাইটকে গালফ কাভার করতে পাঠিয়েছে। তবে ওটার ছবি পেতে দেরি হবে। বিমান যদি ওদিকে থাকে, ছবি আমরা পাবই।' রানা ও তার জাহাজ মার্ভেলের কথা অ্যাম্বাসেডারকে বলল না সলীল।

'লক্ষ লক্ষ স্কয়্যার মাইল কাভার করতে হবে,' বললেন কামাল। 'তার ভিতর রয়েছে পাহাড়ি এলাকা।'

'শুনেছি ওসব স্যাটালাইট হাজার মাইল উপর থেকে যে-কোনও গাড়ির লাইসেন্স প্লেট পড়তে পারে।'

বেশ মুষড়ে পড়েছেন অ্যাম্বাসেডার, বললেন না ওই এলাকা বাংলাদেশের চেয়ে কয়েক গুণ বড়। 'আর কিছু বলবেন?'

'না, আর কিছু নয়। এখন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা।' সলীল বুঝে নিয়েছে ভদ্রলোক একা থাকতে চাইছেন। উঠে দাঁড়াল সে।

'আমার সেক্রেটারিকে একটু আসতে বলবেন?'

'পাঠিয়ে দিচ্ছি।' অফিস থেকে বেরিয়ে গেল সলীল।

থম মেরে বসে রইলেন অ্যাম্বাসেডার। প্রার্থনা করছেন প্রধানমন্ত্রী সুস্থ থাকুন।

'এই যে আপনার অ্যাসপিরিন,' এক হাতে গ্লাস ও অন্য হাতে মাঝারি একটা বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ সেক্রেটারি।

মুখ তুলে চাইলেন অ্যাম্বাসেডার। 'দু'চারটা ট্যাবলেটে কিছুই হবে না, হারুন। পুরো বোতল রেখে যাও। ওটা লাগবে।'

এগারো

দ্য মার্ভেল অভ গ্রীস।

অপারেশন্স সেন্টার।

রায়হান রশিদ ও খোরশেদ নবী দেখছে ভিডিও ডিসপ্লে, খেয়াল নেই কোনও দিকে। দু'জন মিলে সিআইএ ও আমেরিকান ন্যাশনাল রিকনেসেন্স অফিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ্যাক করছে। মিলছে কাঁচা স্যাটালাইট ইমেজারি। ওরা জানে না কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মাসুদ ভাই। একটু আগে মেজর জেনারেল

(অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে মিটিং হয়েছে রানার। তখনই ঠিক হয়েছে ওরা সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম তৈরি করে ঢুকে পড়বে লিবিয়ার ভিতর। খুঁজে বের করবে কোথায় রয়েছে ওই ভূ-পাতিত বিমান। কেউ যদি বেঁচে থাকেন, সম্ভব হলে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে ওই দেশ থেকে।

বেসিক প্যাটার্ন রিকগনিশন সফটওয়্যার দিয়ে ইমেজারি সার্চ করছে রায়হান ও নবী। আশা করছে, শিঘ্রি জানা যাবে কোথায় পড়েছে বিমান। ওদের মত একই কাজ করছে আমেরিকানদের একটি দল। তাদের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রায়হানদের চেয়ে অনেক বেশি সফেসটিকেটেড। তবে অন্তর থেকে জানে রানা, ওর ছেলেরা অন্যদের অনেক আগেই আবিষ্কার করবে এয়ারবাসটা।

'এবার তোর ছাগলা দাড়িটা কেটে ফ্যাল,' কাজের ফাঁকে বলল রায়হান।

মাথা নাড়ল নবী। 'ফেসবুকে যে মেয়ের সঙ্গে খাতির হয়েছে, তুই তো চিনিস, ও কিন্তু বলেছে দাড়িতে আমাকে দারুণ লাগে।'

'তা হলে ওকে বিয়ে করে ফ্যাল। আর কেউ চান্স দেবে না। ওদিকটা দ্যাখ্। ওদিকে ওটা কী?'

'দাঁড়া, ভাল করে দেখি।'

দু'জন ঝুঁকে পড়ল স্ক্রিনের উপর।

কয়েক মুহূর্ত পর ওভারহেড বাতি জ্বেলে দিল রানা। স্ক্রিন থেকে চট্ করে মুখ তুলল রায়হান ও নবী।

তারা একই ব্র্যাণ্ডের জিন্স পরেছে। একই প্রিন্টেড শার্ট। দেখে মনে হয় যমজ। দারুণ খাতির দু'জনের। বিসিআইয়ে আসবার পর গত দু'বছরে বুজম ফ্রেণ্ড হয়ে গেছে।

'মাসুদ ভাই, এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন,' লাজুক স্বরে বলল নবী। লালচে হয়ে গেছে মুখ। ধারণা করছে তিনি ওদের কথা শুনে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি স্ক্রিনের মানচিত্রের দিকে আঙুল

তুলল। ওখানে ভূমধ্য সাগর মিশেছে সাহারা মরুভূমিতে। ত্রিপোলি থেকে বড়জোর পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে। লিবিয়ার তীর গেছে টানা লাইনের মত, কিন্তু এখানে এসে ঢুকেছে সাগর। জায়গাটা নিখুঁত এক ত্রিকোণের মত। আন্দাজ করা যায় ওটা তৈরি হয়েছে মানুষের কল্যাণে। মনিটরের স্কেল বলছে ওই ত্রিকোণ বিশাল আকৃতির।

'নতুন টাইডাল পাওয়ার স্টেশন,' বলল রায়হান। 'মাত্র এক মাস আগে কাজ শেষ করেছে।'

'জানতাম না ভূমধ্য সাগরে জোরালো জোয়ার হয়,' আপন মনে বলল রানা।

'হয় না তো,' বলল নবী। 'তবে জোয়ার বা ভাটা লাগে না ওই পাওয়ার স্টেশনের। জায়গাটা একটা উপসাগরের সরু মুখ। ভিতর অংশ ভাল ভাবে খনন করেছে। উপসাগরের সরু মুখে প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়েছে। তারপর শুকিয়ে নিয়েছে ওই এলাকা। চারদিকের চওড়া জমি গিয়ে মিশেছে মরুভূমিতে। বাঁধের উপর বসিয়েছে অসংখ্য স্লুইস গেট। ওগুলো ঢালু ভাবে বসানো। যখন জোয়ার আসে, গেটের ভিতর দিয়ে আসতে থাকে সাগরের পানি, ঢুকে পড়ে ঢালু পাইপের ভিতর। ঘুরতে শুরু করে টারবাইন, তৈরি হয় ইলেকট্রিসিটি।'

'ভাল বুদ্ধি না,' বলল রায়হান। 'ওই উপসাগর যত বড়ই হোক, শেষ পর্যন্ত ভরে উঠবে সাগরের পানিতে।'

'ওই এলাকার কথা মাথায় রাখো,' বলল রানা। যখন প্রথম ওই প্রজেক্টের কথা শোনে, তখনই বুঝেছে ওটার রহস্য কোথায়। রানার দিকে প্রশ্ন নিয়ে চাইল রায়হান। 'ওই মরুভূমি হচ্ছে আসল রহস্য।'

চট্ করে বুঝে নিল রায়হান। 'দারুণ তো! নিয়মিত শুকিয়ে যাবে পানি!'

'রিযারভয়ের প্রকাণ্ড ও চওড়া হতে হবে, তবে গভীর না হলেও চলবে,' বলল নবী। 'ওরা টিপিকাল ইভাপোরেশন রেট ক্যালকুলেট করেছে, ঠিক করে নিয়েছে কী পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি প্রোডিউস করবে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যায় প্রায় খালি হয়ে গেছে নকল হ্রদ। তারপর আবারও আসে জোয়ার, বাঁধের ওপাশে উঁচু হয় পানি, স্লুইস গেট খুলে দিলেই পাওয়ার হাউস পায় ইলেকট্রিসিটি। দিনের পর দিন চলবে এ-ই।'

'কিন্তু...' আপত্তি তুলল রায়হান।

'বাড়তি লবণ?' হাসল নবী। 'প্রতি রাতে ট্রাক দিয়ে সরিয়ে নেয়। বিক্রি হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে। রাস্তার জন্য ব্যবহার হয় এই লবণ। কমপ্লিট রিনিউয়েবল, পরিষ্কার এনার্জি আর বোনাস হিসাবে প্রতি বছর লিবিয়ান সরকার পকেটে পুরবে কয়েক মিলিয়ন ডলার।'

'কিন্তু সমস্যা তো রয়েই গেল,' বলল রায়হান। 'বছরের পর বছর ইভাপোরেশন হলে ওই সাইট থেকে শুরু করে পিছনের সমস্ত এলাকা বদলাতে থাকবে। পরিবেশ দূষণ হবে।'

'রিপোর্টে লিখেছে ক্ষতির পরিমাণ খুব কম,' বলল নবী।

'ওই রিপোর্ট তৈরি করেছে এক ইতালিয়ান কোম্পানি। ওরাই কিন্তু তৈরি করেছে ওই প্লান্ট।' মৃদু হাসল রানা।

'ওরা তো বলবেই ক্ষতি নেই, আসলে এটা ষড়যন্ত্র,' বলল রায়হান। পশ্চিমা বিশ্বের চক্রান্ত ধরে দেয়ার পর থেকে অতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সব কিছুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

'ওসব নিয়ে এখন না ভাবলেও চলবে,' বলল রানা। 'আমাদের প্রথম কাজ প্রধানমন্ত্রীর বিমান খুঁজে বের করা।'

'মাসুদ ভাই, আপনি জানতে চাইছেন কিছু পেলাম কি না,' বলল নবী। 'কয়েকটা সিনারিয়ো নিয়ে ভেবেছি আমরা। প্রথম কথা, ওই বিমান মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হতে পারে। এমনও

হতে পারে মেশিনারিজে বড় ফেলিওর ছিল। কোনও মিসাইলের আঘাতে বিধ্বস্ত হতে পারে। যদি তা-ই হয়, ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়বে কয়েক শ' স্কয়্যার মাইল জুড়ে। সব নির্ভর করে বিমানের গতি ও উচ্চতার উপর।'

'সেক্ষেত্রে টুকরোগুলো খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে,' বলল রায়হান। 'মিসাইল কোথায় আঘাত হেনেছে তা না জানলে কিছুই বুঝব না।'

'আমরা জানি বিমানের ট্র্যান্সপণ্ডার ও কমিউনিকেশন কখন বন্ধ হয়েছে,' বলল নবী। 'তাদের কোর্স, স্পিড ও কখন ত্রিপোলি এয়ারপোর্টে পৌছাত, এসব থেকে বেরিয়ে আসে অনেক তথ্য। ধারণা করা যায় বিমান পৌচেছে তিউনিশিয়ার সীমান্তে। তবে বিধ্বস্ত হয়েছে লিবিয়ার বর্ডার পেরিয়েই।'

'তোমরা ম্যাপে সেখানে গেছ?' মাল্টিপ্যানেল ডিসপ্লেতে মরুভূমির ইমেজারি দেখছে রানা।

মাথা নাড়ল রায়হান। 'এটা ওখানকার ছবি নয়। ওদিকটা আগেই দেখেছি আমরা। প্রায় কিছুই নেই। ছিল শুধু একটা পরিত্যক্ত ট্রাক। ওদিকে চাকার অনেক দাগ। আমার ধারণা ওগুলো এসেছে সীমান্ত প্রহরীদের তরফ থেকে। তবে ওদিকে বিমান নেই।'

'ভাল,' বলল রানা। 'হয়তো প্রধানমন্ত্রীর বিমান আকাশে বিস্ফোরিত হয়নি।'

'এটা ভাল, আবার একই সঙ্গে খারাপ,' বলল নবী। 'আমরা জানি না ঠিক কী ঘটেছিল। কাজেই বোঝা কঠিন। অক্সিজেন সিস্টেম ফেইল করে সবাই মরল, নাকি ফিউয়েল শেষে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল বিমান? হয়তো আরও পাঁচ শ' মাইল গেছে, হয়তো পড়েছে ত্রিপোলির পুবে। কে বলবে ভূমধ্যসাগরে পড়েনি? আসলে হয়তো ইঞ্জিন নষ্ট হয়। সেটা হলেও, বিমান গ্লাইড করে

মাইলের পর মাইল যেতে পারে, তারপর পড়তে পারে।'

'তা হলে রেডিও বন্ধ হলো কেন?' জানতে চাইল রানা। 'ওরা তো যোগাযোগ করত।'

'আমরা এ নিয়ে ভেবেছি,' বলল রায়হান। 'আসলে প্রতিটি দিক বুঝে এগুতে হবে, নইলে বেরুবে না কোন এলাকায় পড়েছে বিমান। এটা খুব অস্বাভাবিক যে ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হলো রেডিও। কিন্তু অনেক কিছুই ঘটতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এফবিআই তদন্ত করছে। নিউ ইয়র্কের এয়ারপোর্টের গ্রাউণ্ড টিমের সঙ্গে কথা বলেছে। শেষবার ওখানে সার্ভিস করা হয় ওই বিমান।'

'হ্যাঁ, তাদের তদন্ত শেষ হয়নি,' বলল রানা। 'এদিকে বিসিআই ফ্লাইট ক্রুদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে। প্রত্যেকে ছিল বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের। কেউ সিকিউরিটির বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল না।'

'এয়ারফোর্সের কাউকে কিনে নেয়া যাবে না, তা ধরে নেয়া ঠিক হবে?' বলল রায়হান। 'হয়তো গোপন কোনও লিবিয়ান বেসে গিয়ে নেমেছে। আর সে লোক আল-কায়েদার মত কোনও দলের হতে পারে। এ মুহূর্তে নির্যাতন করছে প্রধানমন্ত্রীকে।' চকচক করছে ওর দুই চোখ। আবেগ এসে গেছে। ভাবতে গিয়ে বহু কিছু আসছে মনে।

'কল্পনার ডানায় চড়ে ভাসতে হবে না,' ধমক দিল নবী।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' নাখোশ হয়ে বলল রায়হান। 'ধরে নিই দুই ইঞ্জিন বন্ধ হলো। আমরা জানি গতি ও উচ্চতা কী ছিল, আন্দাজ করা যায় প্রতি মিনিটে পনেরো শ' ফুট নেমে এসেছে। তা হলে পাই আশি নটিকাল মাইল। তার ভিতর নেমেছে বিমান।'

'স্ক্রিনে তা-ই দেখছ?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল নবী।

রায়হান বলল, 'আমরা দেখছি ইঞ্জিন ও রেডিও নষ্ট হওয়ার সিনারিয়ো। এসব খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগেনি। আর তাই আরও ভাল কিছু পেয়েছি।'

ধৈর্য হারাল না রানা। তখনই কিছু বলল না। ওর জানা আছে, সুযোগ পেলে দুই তরুণ এজেন্ট বুদ্ধিমত্তা দেখাতে চায়। ক' মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'বললে আরও ভাল কিছু পেয়েছ, কী সেটা?'

'বিমানের লেজ খসে পড়ে, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান।

'বা লেজের বড় একটা অংশ,' সায় দিল নবী।

'লেজের স্ট্রাকচারাল ফেলিওর হলে রেডিও অ্যান্টেনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর সে-কারণে যোগাযোগ করেনি,' বলল রায়হান। 'একই সঙ্গে নষ্ট হয়েছে বিমানের ট্র্যান্সপণ্ডার।'

'যে ধরনের ক্ষতি, তারপরও বহু দূর যেতে পারে,' শুরু করল নবী। 'আনস্টেবল থাকবে বিমান, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ পাবে না পাইলট। তবে ইঞ্জিনগুলোর অল্টারনেটিভ থ্রাস্ট দিয়ে সরতে পারবে।'

'আমরা জানি বিমানে যথেষ্ট ফিউয়েল ছিল। হয়তো ফেলে দিয়েছে, নইলে ওই ওজন নিয়েই নামতে শুরু করেছে। কী ঘটেছে জানা নেই।' মাথা দোলাল রায়হান। 'ভাবতে দোষ কী ওটা কয়েক শ' মাইল গেছে?'

'কিন্তু তা করেনি, নইলে ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিং করতে পারত ত্রিপোলিতে।'

'গুড পয়েন্ট, নবী,' বলল রানা। 'কিন্তু তারা কোথায়?' বিরক্ত বোধ করছে। বোঝা যাচ্ছে, রায়হান ও নবী কিছু পেয়েছে।

'আমরা আমাদের দুই ধরনের সিনারিয়োকে একত্র করেছি,' বলল নবী। 'ইঞ্জিন ফেলিওর আর লেজ খসে পড়া ছিল মূল সমস্যা। ওসব হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু হতেই পারে। আর

সেক্ষেত্রে আমরা পাই এক শ' স্কয়্যার মাইল। আমরা বিশেষ এলাকা বাছাই করে পেলাম বিমান আকৃতির জিওলজিকাল ফর্মেশন।'

কি বোর্ডে টোকা দিল রায়হান। স্ক্রিনের মাঝখানে আঙুল রাখল। 'আর এই যে, এটা মিলল।'

ঝুঁকে দেখল রানা। স্ক্রিনে পাহাড়ি এলাকা। হেলিকপ্টার ছাড়া ওখানে নামা প্রায় অসম্ভব। হয়তো যেতে পারবে ফোর হুইল জিপ। প্যানেলের কন্ট্রোলে কয়েকটা কি টিপল রায়হান। জুম হয়ে এল ছবি।

'দেখে তো মনে হচ্ছে ওটাই,' বলল রানা।

'বিধ্বস্ত বিমান, আমাদেরও তা-ই ধারণা,' একসঙ্গে বলল রায়হান ও নবী।

যোগ করল নবী, 'তবে নিশ্চিত না হয়ে বলি কী করে!'

'এখন নিশ্চিত হয়েছ?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রানা। 'ভবিষ্যতে আগেই বলবে কী পাওয়া গেছে।'

লজ্জা পেয়ে বলল দুই বন্ধু, 'জী, মাসুদ ভাই।'

একটা পাহাড়ের উপর পড়েছে বিমান। কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। পাহাড়ি ঢালের উপর আধ মাইল জুড়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রথম যখন বিমান মাটিতে নেমে আসে, সে জায়গা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। লাফিয়ে ওঠে বিমান, তারপর পেট দিয়ে আবারও পড়ে। গতি কমবার সঙ্গে ছিঁড়তে থাকে। দ্বিতীয়বার নেমে আসবার পর টুকরো টুকরো হয়। সেগুলোর মাঝে মাটি পুড়ে গেছে। ফিউজেলাজের তিন ভাগের দুই ভাগ একইসঙ্গে রয়ে গেছে। আগুনে পুড়ে কালো। দু'পাশে পড়ে আছে ডানার টুকরো। এয়ারক্রাফট থেকে এক শ' ফুট দূরে একটা ইঞ্জিন। দ্বিতীয়টা দেখতে পেল না রানা।

'জীবিত কেউ নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রায়হান।

'নতুন স্যাটালাইট ইমেজারি পাব আবার দশ ঘণ্টা পর,' বলল নবী। 'তখন দুটো মিলিয়ে দেখব। কিছু বদলে থাকলে, তা ধরা পড়বে। কিন্তু মনে করি না ওই ক্র্যাশের পর কেউ বাঁচবে। আগুন ধরে গিয়েছিল বিমানে।'

থমথম করছে রানার মুখ। বলল, 'অনেক দেরি করিয়ে দিলে, তবে গুড ওঅর্ক বয়েজ। আমার কমপিউটারে নোট সহ পাঠিয়ে দাও কোঅর্ডিনেট্স্। আমাদের চিফ চাইবেন আমরা তদন্ত করি। ধরে নিতে পারো ওই সাইটে যেতে হবে। এবং পৌঁছুতে হবে লিবিয়ানদের আগেই। এবার দেখো ওরা কোথায় খুঁজছে।'

'প্রায় আড়াই শ' মাইল দূরে,' বলল রায়হান। 'আমার ধারণা ভান করছে। ভাল করেই জানে আমেরিকানদের স্যাটালাইট খুঁজে বের করবে বিমান। লিবিয়ান সরকার তথ্য পেলে নিজেদের লোকদের বলবে কোথায় পড়েছে এয়ারবাস।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু ওদের আগেই হাজির হতে হবে। হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারব না, কাজেই ম্যাপ দেখে পথ বেছে রাখো।' বিমান দুর্ঘটনার কথা ভাবতে তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর। মানুষগুলো কতটা ভয় পেয়েছিল? পাহাড়ের কাঁধে নেমে আসছে বিমান! কী ছিল মানুষগুলোর শেষ ভাবনা?

এক ঘণ্টা পর। নিজের কেবিনে বসে আছে রানা, হাতে জ্বলছে সিগারেট। কুণ্ডুলি পাকিয়ে সিলিঙের দিকে উঠছে ধোঁয়া। ঠিক হয়েছে আজ রাতে ত্রিপোলি বন্দরে ভিড়বে মার্ভেল। এক লিবিয়ান ডিআইজিকে ঘুষ দিয়ে কাস্টমসের কড়াকড়ি এড়িয়ে গেছে বিসিআইয়ের স্থানীয় এজেন্ট। জাহাজ থেকে নামিয়ে নেয়া হবে বিশেষ একটি ট্রাক। ওটা তৈরি করেছেন বিসিআইয়ের অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ডক্টর শামশের আলী ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স গবেষণাগারে। মাস দুয়েক আগে ওটা তুলে দেয়া হয়েছে জাহাজে। এদিকে

লিবিয়ান ডিআইজির মাধ্যমে জোগাড় হয়েছে রানা-স্বর্ণা-নিশাত-ফেং-নবী ও কাশেমের ভিসা।

মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান জানিয়ে দিয়েছেন, ওদের খুঁজে দেখতে হবে কেন ধ্বংস হলো বিমান। কেউ বেঁচে থাকলে তাঁকে সরিয়ে নিতে হবে।

স্যাটালাইট ইমেজের হার্ড কপির দিকে চাইল রানা। বিমান পতিত হওয়ার প্যাটার্ন দেখবার পর থেকে খচ্ খচ্ করছে মন। কী যেন মেলে না। কিন্তু কী মিলছে না, জানে না। ইন্টারনেট থেকে নানা বিমানের ধ্বংসাবশেষের ছবি ডাউনলোড করেছে, কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে এয়ারবাসের তফাত খুঁজে পায়নি। অবশ্য কোনও ধ্বংসাবশেষ একই রকম হয় না। এমন কিছু নেই যা দেখে মনে হয় অস্বাভাবিক। তবু কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে।

আরবদের মতই গড় গড় করে আরবি বলে রানা। বেশ কয়েকবার এসেছে লিবিয়ায়। ওর ধারণা খুব সচেতন নয় লিবিয়ার জনতা, রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতে ভীষণ দ্বিধা তাদের। দেশে স্বৈর-শাসক থাকলে যা হয়। তবে বদলাতে শুরু করেছে পরিস্থিতি। এখন একদল লোক চাইছে মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে। তাদের সহায়তা দিয়ে চলেছে পশ্চিমা বিশ্ব।

শেষে হয়তো লাভ হবে শুধু শ্বেতাঙ্গদেরই।

এয়ারবাসের বিষয়টি জেঁকে বসেছে রানার মনে। বুঝতে পারছে এ মিশনে নিজ লোক ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা মস্ত ভুল হবে। ওই পাহাড়ে গিয়ে খুঁজে নেবে ওরা ফ্লাইট ভয়েস রেকর্ডার, সংগ্রহ করবে লাশের ডিএনএ। ডিএনএ-র ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত ধরে নেয়ার কারণ নেই প্রধানমন্ত্রী মারা গেছেন।

এয়ারবাস ধ্বংসাবশেষে কী যেন অস্বাভাবিক, কিন্তু তা ঠিক কী, ধরতে পারছে না রানা।

বারো

দেখা গেল, মার্ভেলকে যে বন্দরে ভিড়াবে, সেই হার্বার পাইলটই ওদের কন্ট্যাক্ট। হাসিখুশি, মাঝারি উচ্চতার লোক সে। কোঁকড়া চুলগুলো এখানে-ওখানে ধূসর হচ্ছে। উঁচু কপাল, নীচে ঘন জোড়া ভুরু। ডান দিকেরটা খানিক কাটা পড়েছে। বোধহয় ছুরি বা বাসনের কানার আঘাতে। যখন চুপ থাকে, মাড়ির ফোকর বুজে রাখে জিভ দিয়ে। সামনে বেড়ে থাকে চিবুক। বোধহয় গত কিছুদিনের ভিতর ভেঙেছে দুই দাঁত। ঠোঁটের এক কোণে কালসিটে। মারধর খাওয়ার চিহ্ন।

রানাকে বলেছে, এ কাজ নিয়েছে শুধু বাড়তি টাকা পাওয়ার জন্য। তার পরিবারের সদস্য বারোজন। আট ছেলে-মেয়ে, বুড়ো বাবা-মা এবং তারা স্বামী-স্ত্রী। শুধু তাই নয়, তার এক শালা দুবাইয়ে কনস্ট্রাকশনের চাকরি খুইয়েছে, ফলে ওই পরিবারও এসে উঠেছে তার বাড়িতে। এদিকে বড় মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। সব মিলে বিপদের ভিতর রয়েছে সে।

এসবই জানা গেল বোর্ডিং ল্যাডার বেয়ে উঠবার সময়। তাকে সুপারস্ট্রাকচারে ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিয়ে এল রানা।

'কোনও সন্দেহ নেই আপনি অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ, জনাব হারিস,' গম্ভীর চেহারায় বলল রানা। যা বলছে নিজে তার এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না। ওর ধারণা, শহরে কোথাও উপ-পত্নী রাখতে গিয়ে চুরি-বাটপাড়ি করে লোকটা। আর সে কারণেই স্ত্রী

বা উপ-পত্নীর হাতে নিগৃহীত হয়ে তার দাঁত ভেঙেছে।

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল সারেং। প্রায় অন্ধকার কেবিনে জ্বলজ্বল করছে তার সিগারেটের ডগা। দিগন্তে হারিয়ে গেছে সূর্য, নেমে এসেছে আঁধার। বন্দর এলাকা থেকে বেশ দূরে থেমেছে মার্ভেল। লবণ ভরা পোর্টহোল দিয়ে শহরের মৃদু আলো আসছে। রং-জ্বলা ডেস্ক ল্যাম্প জ্বেলে দিয়েছে রানা। নিজে মেকআপ করে সামান্য পাল্টে নিয়েছে চেহারা। কাঁধ ছেয়ে যাওয়া নকল চুলগুলো কালো। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। তুলার কারণে ফুলে আছে দুই গাল। চায় না হারিস ওকে ভাল করে চিনে রাখুক। অবশ্য ওর অভিজ্ঞতা বলে, এ ধরনের লোক কখনও কারও দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে না।

'আমরা সবাই বাধ্য হয়ে কত কিছুই না করি,' বলল কন্ট্যাক্ট হারিস। একটা অতি ব্যবহৃত লেদার ব্রিফকেস ডেস্কের উপর রেখে ঢাকনি খুলে ফেলল। 'আমাদের উভয়ের কমোন বন্ধু বলেছে একটা ট্রাক নামাতে হবে জাহাজ থেকে। সেই সঙ্গে লাগবে কয়েকজনের ভিসা। পাসপোর্টে স্ট্যাম্প দিতে হবে।' কয়েকটা কাগজ বের করল সে। উপরেরটা কাস্টমসের স্ট্যাম্প। এই রুটিন ভাল করেই জানে রানা, পাসপোর্টগুলো বাড়িয়ে দিল। মোফিজ বিল্লাহ্‌র জাদুর দোকান থেকে এসেছে এগুলো। ছবি ছাড়া সব তথ্য মিথ্যা।

কয়েক মিনিট ধরে নাম ও তথ্যগুলোর রেকর্ড টুকল হারিস, তারপর প্রতিটি পাসপোর্টে বসিয়ে দিল স্ট্যাম্প। কাজ শেষে রানার হাতে দিল। এবার আরও কয়েকটা কাগজ বের করল। 'এগুলো দেবেন কাস্টম্‌স্ ইন্সপেক্টরকে। এসব ট্রাকের জন্য। আর এগুলো...' ব্রিফকেস থেকে দুটো লাইসেন্স প্লেট বের করে ডেস্কের উপর রাখল। 'এ দুটো রাখুন। কেউ প্রশ্ন তুলবে না, অনায়াসে যেতে পারবেন দেশের যে-কোনও জায়গায়।'

ভালই হলো, শহরতলী থেকে কোনও গাড়ির লাইসেন্স প্লেট চুরি করতে হবে না। রানা বলল, 'দেখছি, নিখুঁত কাজ করেন আপনি। অনেক ধন্যবাদ।'

চওড়া হাসল লিবিয়ান। 'সব ব্যবসা, বুঝলেন? কাস্টমারকে সেরা সেবা দিই আমি। সব সময়।'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

'আর ওই প্লেটের জন্য লাগছে আপনার মাত্র পাঁচ শ' ডলার।'

শালা ক্ষুধার্ত কুমিরের মত মস্ত হাঁ করেছে, মনে মনে বলল রানা।

'নম্বর কেমন মনে রাখেন?' জানতে চাইল হারিস।

'নম্বর?'

'হ্যাঁ, নম্বর। আমার মোবাইল ফোনের নম্বরটা দিতে চাই। কিন্তু ওটা আবার কাগজে টুকে রাখবেন না।'

'বলুন, মনে থাকবে।'

একের পর এক ডিজিট বলে গেল হারিস। 'এই নম্বরে যোগাযোগ করলে এক লোক ধরবে। সে খবর দেবে আমাকে। এক ঘণ্টার ভিতর আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।' হাসি ফুটল তার মুখে। 'অবশ্য আমার বউয়ের সঙ্গে বিছানায় থাকলে... বুঝতেই তো পারছেন!'

বাধ্য হয়ে ওর হাসিতে যোগ দিল রানা। 'মনে করি না আপনার সার্ভিস আবার লাগবে, তবে ধন্যবাদ।'

মুখের হাসি হাসি ভাব বদলে গেল হারিসের, জোড়া ভুরুর নীচে সরু হয়ে গেল দুই চোখ। 'আমার ধারণা ক'জন লোক বা মেয়েলোক এ দেশের বড় কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তবে কোনও সংবাদপত্রে অস্বাভাবিক কিছু যদি দেখি, সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠব। আর সেক্ষেত্রে দেরি না করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমার জানা আছে কী ভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা

যায়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কী বলতে চাই?'

এ সতর্কবাণী শুনে রাগল না রানা। এ শুনবার জন্য তৈরিই ছিল। প্রতিবছর কমপক্ষে এক ডজন লোক ওকে বলে এসব। তাদের কারও কারও ক্ষমতা নেই, তা-ও নয়। হয়তো হারিস তাদের একজন। দেখে প্যাঁচালো লোক মনে হয় না, কিন্তু হতে পারে অন্য রকম। এ যদি ওদেরকে বিপদে ফেলে, বদলে বিপদ হবে তার নিজেরই। ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে ওরা।

'নিশ্চয়ই তাদের প্রধানমন্ত্রী মারা যাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার বিচলিত,' মন্তব্য করল হারিস।

'হওয়ারই কথা,' বলল রানা। 'তবে আমার পাসপোর্টে নিশ্চয়ই দেখেছেন, আমি ভারতীয় নাগরিক। পুবের ওই দেশের সরকার কী করছে তার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।'

'ওরা নিশ্চয়ই বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে চাইছে?'

'তা-ই তো মনে হয়,' নির্বিকার স্বরে বলল রানা।

'আর আপনারা ঠিক কোথা থেকে এসেছেন?' হঠাৎ জানতে চাইল হারিস।

'নেপ্‌ল্‌স্।'

'তার মানে ইতালি?'

'হ্যাঁ।'

আস্তে করে মাথা দোলাল হারিস। এবার বলল, 'আপনি তো ভারতীয়। হয়তো আপনাদের সরকার চাইছে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে?'

রানা বুঝল লোকটা আসলে নিশ্চয়তা চাইছে ওরা ওই বিমান খুঁজতে এসেছে, এর চেয়ে খারাপ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। লোকটাকে খানিক স্বস্তি দিতে বলল, 'নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকার ওই বিমান খুঁজতে লিবিয়ার সরকারকে সহায়তা দিতে চাইবে।'

হাসি ফিরল সারেঙের মুখে। 'গতরাতে টেলিভিশনে বক্তৃতা

দিয়েছেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আলী। তিনি বলেছেন ওই হারিয়ে যাওয়া বিমানের ব্যাপারে কেউ কিছু জানলে, যেন দেরি না করে জানায়। ওটা পাওয়া গেলে কারও ক্ষতি নেই, কী বলেন?'

'তা-ই তো মনে হয়,' বলল রানা। বিরক্ত বোধ করছে। লোকটা একের পর এক প্রশ্ন করছে। ডেস্কের ড্রয়ার টেনে খুলল রানা। ঝুঁকে এল হারিস। পেট-মোটা এনভেলপ বের করল রানা, থপ্ করে রাখল ডেস্কের উপর। বুক পকেট থেকে বের করল কয়েকটা নোট, পাঁচটা এক শ' ডলার বের করে এনভেলপের সঙ্গে যোগ করল। 'এই যে আপনার সম্মানী।'

খামটা খপ্ করে তুলে নিল হারিস, রেখে দিল ব্রিফকেসের ভিতর। ধপ্ করে বন্ধ হলো ঢাকনি। 'আমার যে বন্ধু আমাদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন আপনি খুব সম্মানিত, ভদ্র লোক। তাঁর কথা মেনে নিয়েছি বলেই আর গুণব না টাকাগুলো।'

এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করল না রানা। ওর ধারণা এ লোক মার্ভেলকে বার্থে রাখবার আগে কমপক্ষে দু'বার গুণবে ডলারগুলো। 'আপনি আগেই বলেছেন, ব্যবসা হচ্ছে কাস্টমারকে সন্তুষ্ট রাখা,' বলল রানা। 'সেই সঙ্গে নিজের সুনাম বজায় রাখা।'

'ঠিক কথা।' উঠে দাঁড়াল দু'জন, করমর্দন করল। 'এবার, ক্যাপ্টেন রানা, দয়া করে ব্রিজে চলুন। আর দেরি করাতে চাই না আপনাকে।'

'চলুন, যাওয়া যাক।'

রানা শুনেছে, সংগঠিত অপরাধ চক্রের শুরু প্রাচীন ফিনিশিয়ান বন্দরগুলোতে। ক'জন মজুর মিলে একটা মদের বোতল চুরি করে। কাজটা করতে গিয়ে কয়েক চুমুক গিলতে দেয় প্রহরীদেরকে। এবং দেখে ফেলে কেউ, সে লোকই মজুরদের

উৎসাহিত করে আরও জিনিস চুরি করতে। একটা চুরির জন্য লাগে তিনটি জরুরি জিনিস, চোর, অপরাধপ্রবণ প্রহরী এবং ওই এলাকার দুর্নীতি-পরায়ণ কর্তৃপক্ষ। হাজারো বছর পেরিয়ে গেলেও সব একই রকম চলছে, তবে চুরির মাত্রা বেড়েছে কোটি গুণ। বন্দর এলাকা মানেই চোর-বাটপার ও ডাকাতের আস্তানা। কেউ সরকারী পদে আসীন ডাকাত, কেউ বেসরকারী ভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

কন্টেইনার আবিষ্কার হওয়ার পর কমে গেল চুরি-ডাকাতি। জিনিস থাকত তখন বাক্সের ভিতর। তারপর নানা ধরনের মাফিয়া ডন বুঝল, কী করতে হবে। তারা পুরো কন্টেইনারই লোপাট করতে লাগল।

একটু দূরে ডক। এ মুহূর্তে উইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওর পাশে প্রিয় বন্ধু সোহেল আহমেদ, ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। তবে ধোঁয়া দিয়ে ভাগাতে পারছে না ডকের বাঙ্কার অয়েল ও পচা মাছের দুর্গন্ধ। মার্ভেল যে বার্থে থেমেছে, তার পাশ দিয়ে গেছে মোবাইল ক্রেন। ক্রলার ট্রেডগুলো থেকে ঝুলছে কন্টেইনার। ওটা তুলে নেয়া হয়েছে এক কোস্টাল ফ্রেইটার থেকে। ক্রেনে কোনও বাতি জ্বলছে না। বন্ধ রাখা হয়েছে গ্যান্ট্রি লণ্ঠনগুলো। ট্র্যাকটর ট্রেইলার অপেক্ষা করছে মাল বহন করতে। ওটার হেডলাইট নেভানো। কন্টেইনারের পাশে দাঁড়িয়েছে এক কর্মী, হাতে একটু পর পর জ্বলছে টর্চ। সেই আঁচমকা আলো-আঁধারিতে খানিক দেখা যায়। মিস্টার হারিস মার্ভেলকে এখানে রেখেই ছুটে গেছে আনলোডিং দেখতে। ডকে তাকে দেখছে রানা। ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কী যেন বলছে সে। এত আলো নেই যে খাম বদলের দৃশ্য চোখে পড়বে। অবশ্য মার্ভেলের লো লাইট ক্যামেরা সবই ধরছে।

'আমাদের কন্ট্যাক্ট ভাল মক্কেলই ধরেছে,' বলল সোহেল।

'খুব ব্যস্ত লোক এই হারিস!'

'ক্যাসাব্লাঙ্কায় ক্লড রেইন্স বলে, "আমি শুধু বেচারা এক দুর্নীতি-পরায়ণ কর্তৃপক্ষ।"'

ওয়াকি-টকিতে স্বর্ণার কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা। 'হ্যাচের ঢাকনি খুলে নেয়া হয়েছে। আমরা তৈরি।'

'ঠিক আছে। হারিস জানিয়েছে আমরা চাইলে মার্ভেলের ক্রেন দিয়ে ট্রাক আনলোড করতে পারি। সবাই কাজে নেমে পড়ুক।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

রহস্যময় জাহাজের উল্টো ডকে থেমেছে মার্ভেল, ঘুটঘুটে অন্ধকারে। দূরে বিশাল এক কন্টেইনার শিপ থেকে মাল নামিয়ে চলেছে উঁচু ক্রেনগুলো। সোডিয়াম-ভেপার আলোয় দিন হয়ে গেছে ওদিক। সিকিউরিটি ফেন্সের ওপাশে আলোর বাইরে অন্ধকারে শত শত কন্টেইনার। ওখানে রয়েছে একের পর এক ওয়্যারহাউস ও বিশাল উঁচু অয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক।

দিগন্তের দিকে বাহু বাড়িয়ে কাজ শুরু করেছে মার্ভেলের ডেক ক্রেন। ড্রাম থেকে বেরুচ্ছে স্টিলের কেবল। খোলা এক হ্যাচের উপর গেল ক্রেনের বাহু। স্টিলের তার নেমে গেল হোল্ডের ভিতর। দু' মিনিট পর ট্যাকলের মাধ্যমে উঠে আসতে লাগল মাল। সহজেই ওজন নিল বুম।

আঁধারে বিস্তারিত কিছু দেখা গেল না। তবে বোঝা গেল উঠে আসছে ডক্টর শামশের আলীর গর্বের সেই বস্তু। যে-কেউ দেখে বলবে ওটা অতি সাধারণ এক মাল-টানা ট্রাক। এক পাশে নকল অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানির নাম। ট্রাকের বাইরের অংশ যেমন তেমন, কিন্তু চেসিসটা মার্সিডিজ ইউনিমগ। ওটাই একমাত্র জিনিস যা মডিফায়েড নয়। নানা দিক দিয়ে বদলে নেয়া হয়েছে টার্বোডিজেল ইঞ্জিন, ঠিক ভাবে টিউন্ড্ থাকলে শক্তি মেলে আট শ' হর্সপাওয়ার। আর নাইট্রিয়াস অক্সাইড বুস্ট দেয়া হলে ইঞ্জিন

দেবে এক হাজার হর্সপাওয়ার। পুরু সেলফ সিলিং টায়ারগুলোর উপর আর্টিকিউলেটিং সাসপেনশন। প্রয়োজন পড়লে উঁচু-নিচু করবে ট্রাককে। উঁচু করলে তখন দুই ফুট নীচে থাকবে মাটি। অর্থাৎ আমেরিকান আর্মির দোতলা হামভির চেয়ে ছ' ইঞ্চি উঁচু। চারজন আরোহী অনায়াসে বসতে পারে ক্যাবে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে রাইফেলের গুলিতে কিছুই হয় না সামনের চাকার। বাক্সের মত ক্যাব একই ভাবে আর্মার্ড।

প্রথম যখন বিসিআইয়ের সবাই জানল ডক্টর শামশের আলী কী পরিকল্পনা করেছেন, মেজর জেনারেল, রানা ও সোহেল ছাড়া অন্যরা পেট কাঁপিয়ে হেসেছে। পাগলা বৈজ্ঞানিকের নাম দিয়েছে "কিউ", জেমস বণ্ড বই বা সিনেমার সেই বিখ্যাত আর্মারার। ট্রাকের সামনের বাম্পারে রয়েছে .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। যন্ত্র-দানবের দু'পাশে র‍্যাকের ভিতর রয়েছে গাইডেড রকেট। রয়েছে জেনারেটার, এতই ঘন ধোঁয়া তৈরি করে, চারপাশ আঁধার করে দেয়। ছাতে রয়েছে একটা হ্যাচ, ওখান দিয়ে ছোঁড়া যায় একের পর এক মর্টার। ওটার বদলে রাখা যায় .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান বা অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার। মিশন বুঝে কার্গো এরিয়া বদলে নেয়া যায়। ওটা হয়ে উঠতে পারে মোবাইল সার্জিকাল সুইট, হতে পারে লুকানো রেইডার স্টেশন। সেসব যদি না লাগে, পিছন অংশ ব্যবহার করা যায় ট্রুপ ক্যারিয়ার হিসাবে। সেখানে বসতে পারে পুরোপুরি সশস্ত্র দশজন সৈনিক।

ট্রাকের চাকা স্বাভাবিকের চেয়ে খানিক বড়, এটুকুই তফাত, এ ছাড়া কেউ সন্দেহ করবে না এই জিনিস ব্যতিক্রম কিছু। ডক্টর শামশের আলী ট্রাকের নাম দিয়েছেন 'সুন্দরী'। মার্ভেলের মতই শক্তপোক্ত, তফাৎ শুধু সুন্দরী মাটিতে চলে। কোনও ইন্সপেক্টর পিছনের দরজা খুললে দেখবে ঠাসা ছয়টি পঞ্চান্ন গ্যালনের ড্রাম। লোকটা যদি সন্দেহের বশে পিছনের সারি ড্রাম সরায়, সেক্ষেত্রে

বেরুবে দ্বিতীয় সারি ড্রাম। পিছনেরগুলো সত্যিই বাড়তি ফিউয়েল। ওগুলোর কারণে সুন্দরী আট শ' মাইল চলতে পারে। দ্বিতীয় সারির ড্রামগুলো আড়াল দিয়েছে ট্রাকের ভিতর অংশকে। আশা করা হয়েছে কেউ এই সারির ড্রাম সরাবে না।

'দেখা যাক পাগলা প্রফেসরের প্রেমিকা কেমন কাজের,' নিচু স্বরে বলল সোহেল।

'আমার পুরো বিশ্বাস আছে তাঁর উপর,' বলল রানা। বন্ধুর দিকে চাইল। 'তোরা মার্ভেলকে কখন সরিয়ে নিবি?'

'তোরা ত্রিপোলি থেকে সরে গেলেই। গগলের সঙ্গে কথা হয়েছে। বন্দর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে যাব। বিমান যেখানে ক্র্যাশ করেছে, ঠিক তার উত্তরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় বসে থাকব। দশ মিনিটের নোটিসে আকাশে উঠবে হেলিকপ্টার।'

'তোরা যেখানে থাকবি, তাতে হেলিকপ্টারের ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। তবুও ভাল। হাতের পাঁচ থাকল। সব যদি পরিকল্পনা মত চলে, তোরা সাগরে থেকে আমাদের অনুসরণ করবি। এদিকে আমরা ঢুকে পড়ব তিউনিশিয়ার জমিতে।'

'আশা করা যায় তোর "সি প্ল্যান" প্রয়োজন পড়বে না।'

হুইলহাউসের স্পিকারে স্ট্যাটিকের আওয়াজ শুরু হলো। ঘরে ঢুকে মাইক্রোফোন নিল রানা, 'রানা বলছি।'

'সুন্দরীকে ডকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, মাসুদ ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'রায়হান ভাইয়ের কাছে জানলাম লিবিয়ানদের সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম কাজ করছে ক্র্যাশ এলাকা থেকে তিন শ' মাইল দূরে।'

'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট পর গ্যাংওয়ের উপর দেখা হবে,' বন্ধুর পাশে এসে ফ্লাইং ব্রিজে থামল রানা।

ফুরিয়ে আসা সিগারেট টোকা দিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিল সোহেল। একটু দূরে গিয়ে সাগরে পড়ল আগুন। সঙ্গে সঙ্গে নিভে

গেল। 'আমার ভাল লাগছে না, রানা। তোদের মিশন আছে। কিন্তু আমি? জাহাজের পাহারাদারের মত শুধু বসে থাকব।'

'জাহাজের পুরো দায়িত্ব তোর হাতে,' বলল রানা। 'আর কখন তোকে লাগবে কেউ জানে না।'

'কয়েক মাস পেরুল কোনও অ্যাকশনে নেই। এতে মন ছোট হয়।'

'বুঝি। প্রথম সুযোগেই উড়াল দিবি তুই।'

'যদি কোনও মিশন পাই।'

'হয়তো পাবি,' বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'আপাতত চললাম রে। দুই থেকে তিন দিন পর দেখা হবে।'

'চল, তোকে পৌঁছে দিই ডক পর্যন্ত।'

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুই অকৃত্রিম বন্ধু।

সুন্দরীকে নিয়ে চলেছে রানা, পাশে শটগান হাতে খোরশেদ নবী। পিছনের বেঞ্চ সিটে পাশাপাশি লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণা ও ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। প্রত্যেকের পরনে খাকি জাম্পসুট। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য-প্রাচ্যে অয়েল ওঅর্কারদের ইউনিফর্ম বলতে, এ-ই। চুলগুলো বেসবল ক্যাপের নীচে গুঁজে রেখেছে স্বর্ণা। একই কাজ করেছে নিশাত। দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে ওভারসিজ কাজের জন্য এসেছে দুই তরুণ, এখনও গোঁফ-দাড়ি গজায়নি।

ভোরের ধূসর আলো ফুটতে বেশ দেরি। ওরা পিছনে রেখে এসেছে ত্রিপোলি শহরের ঝলমলে আলো। উপকূলবর্তী সড়কে ট্রাফিক নেই বললেই চলে। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে কোনও রোডব্লকের সামনে পড়েনি। সাইরেন বাজিয়ে গেছে এক পুলিশ ক্রুজার। মাথার উপর জ্বলছিল আলো। তবে ট্রাক থামায়নি, দ্রুত গতিতে চলে গেছে। তারপর থেকে কোনও গাড়ি চোখে পড়েনি।

নকল কাগজপত্রের বিষয়ে পুরো নিশ্চিন্ত রানা। এখন যতক্ষণ পারা যায় এগুতে চাইছে। নিয়ম মাফিক তল্লাসী নিয়ে ভয় নেই, যত চিন্তা দুর্নীতি-পরায়ণ পুলিশ নিয়ে। এরা রোডব্লক তৈরি করে ঘুষ দাবি করে। কখনও থানায় ধরে নিয়ে যেতে চায় ঝগড়াটে পুলিশ। সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে। পরিস্থিতি প্যাঁচালো হতে পারে, কাজেই পকেটে লিবিয়ান দিনার রেখেছে রানা।

আরও দুই মাইল গেলে ডানে মরুভূমিতে যাওয়ার সরু পথ। সুন্দরীর ইন্টিগ্রেটেড ন্যাভিগেশন সিস্টেম ওদের নিয়ে যাবে ভূ-পাতিত বিমানের কাছে।

নীরবে পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল রানা।

দূরে রোডব্লক দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেখানে ওরা হাইওয়ে ছেড়ে মরুভূমিতে প্রবেশ করবে, তার মাত্র দুই শ' ফুট এদিকে রোডব্লক! চেক করা হচ্ছে একটা সিভিলিয়ান গাড়ি। পাশের লেন ব্লক করা হয়েছে দুটো ক্রুজার পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে। বোঝা যাচ্ছে, রানাদের নয়, থামাতে চাইছে মরুভূমির দিক থেকে আসা গাড়ি। কিন্তু তাই বলে সতর্কতায় ঢিল পড়ল না রানার। এটা পুলিশের ধোঁকা দেবার একটা কৌশলও হতে পারে।

ব্রেক কষে গতি কমাতে শুরু করেছে রানা।

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়,' বিড়বিড় করে বলল নবী।

রিফ্লেকটিভ ভেস্ট পরনে এক পুলিশ ঝুঁকে পড়েছে সেডানের জানালায়। ভিতরে ফেলছে ফ্ল্যাশলাইট। একটা ক্রুজারের ভিতর আরও দু'জন পুলিশকে দেখল রানা। ওর ধারণা হলো, চতুর্থ আরেকজন আড়ালে কোথাও অপেক্ষা করছে।

গতি আরও কমিয়ে এনেছে রানা। জানতে চাইল, 'নবী, রোডব্লক এড়িয়ে আর কোনও রাস্তায় মরুভূমিতে ঢোকা সম্ভব?'

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'না, মাসুদ ভাই। স্যাটালাইটের ইমেজ থেকে রুট ঠিক করেছে রায়হান। রোডব্লক পেরুলে খানিক বাদেই সরু পথ। ওই পথেই যেতে হবে, নইলে শুরু হবে খাড়া টিলা। তবে কিছুদূর পিছিয়ে গেলে পাব আরেকটা কাঁচা ট্রেইল, ওটা পৌঁছে দেবে টিলার উপর। ওখান দিয়ে মরুভূমিতে নামা যেতে পারে।'

'এখন আর পিছানো সম্ভব নয়। তার মানে আমাদের সামনেই এগুতে হবে।'

'আসলে তা-ই।'

রোডব্লকের বিশ ফুট দূরে রাস্তার বাম ঘেঁষে থামল ট্রাক। সিভিলিয়ান গাড়িটা ছাড়া পেলে ট্রাকের পাশ কাটিয়ে সহজেই যেতে পারবে।

সিটের পাশের পকেটে হাত রাখল রানা, একবার স্পর্শ করে নিল প্রিয় ওয়ালথার পি.পি.কে-টা। প্রয়োজন পড়লে বের করবে। রোডব্লকের দিকে চাইল, সেল্ফ্-ড্রিভেন ওই গাড়িতে রয়েছে মালিকের গোটা পরিবার। স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে মহিলা। টর্চের আলোয় দেখা গেল চাঁদের মত গোল মুখ। মহিলা কাঁধের উপর দুলিয়ে চলেছে এক শিশুকে। ভেসে এল বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। ব্যাক সিটে তার ভাই, বছর চারেকের। চালক বা পুলিশের বক্তব্য বুঝল না রানা। তবে মনে হলো উত্তপ্ত কথা চলছে। গলা উঁচিয়ে কী যেন বলছে ছেলের বাবা।

'কী অপরাধে আটকালো?' আপন মনে বলল স্বর্ণা।

রানা জবাব দেয়ার আগেই, জানালা থেকে এক পা পিছিয়ে গেল পুলিশ, ঝটকা দিয়ে বের করল পিস্তল। তীক্ষ্ণ সুরে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, কাঁদছে ব্যাকসিটের বাচ্চাটাও। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার উপর দু'হাত তুলেছে মহিলার স্বামী।

পুলিশ ক্রুজারের দুই দরজা খুলে গেল, ছিটকে বেরিয়ে এল

গাড়িতে বসা দুজন। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। একজন চলল প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা লক্ষ্য করে। আর তার সঙ্গী অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটে এল রানাদের দিকে। পিস্তল তাক করেছে ক্যাবের উইণ্ডশিল্ড বরাবর।

সবই বুঝল রানা, তবে দেরি করে। আসল টার্গেট ওরাই, এতক্ষণ অভিনয় চলছিল। প্রচণ্ড রেগে গেল ও নিজের উপর।

সুইচ টিপে গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট খুলে ফেলেছে ক্যাপ্টেন নবী, স্বয়ংক্রিয় ভাবে বেরিয়ে এসেছে ট্রে। উপরে ফ্ল্যাট-প্যানেল ডিসপ্লে, কি-বোর্ড ও খুদে জয়স্টিক। আঁধারে কি-বোর্ড টিপতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল নবী, অথচ এখনই চালু করতে হবে মেশিনগান।

সামনের সিভিলিয়ান গাড়ির জানালা দিয়ে গুলি করল পাশে দাঁড়ানো পুলিশটা। লাল কুয়াশার ভিতর হারিয়ে গেল চালকের মাথা, আচমকা বিস্ফোরিত হয়েছে। উইণ্ডশিল্ডে ছিটকে লাগল চটচটে রক্ত ও হলদেটে মগজ। ভিতরের দৃশ্য হারিয়ে গেল রানার চোখ থেকে। আরও দু'বার গুলি করল লোকটা। মহিলা ও শিশুর কান্না থামল মাঝপথে। চতুর্থবার গুলি হলো। রানা নিশ্চিত, মেরে ফেলেছে পিছন সিটে দাঁড়ানো ছেলেটিকেও!

ঘুষ না দেয়ার অপরাধে? আশ্চর্য!

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেছে রানার, যন্ত্রের মত চলছে হাত-পা, গিয়ার দিয়েই চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। দ্রুত গতি তুলবার ক্ষমতা নেই সুন্দরীর, তবে ক্রুদ্ধ সিংহীর মত গর্জে উঠে হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল। ওদের দিকে ছুটে আসছিল ক্রুজারের দ্বিতীয় জন, হঠাৎ থমকে গেল মাঝপথে, ট্রাকের মতলব ভাল না বুঝে পিস্তল তুলে গুলি শুরু করল। প্রথম দুটো বুলেট লাগল সেফটি গ্লাসে, তৈরি হলো খুদে গর্ত। পরেরগুলো ছিটকে গেল ট্রাকের আর্মার্ড প্লেটে লেগে।

'পেয়েছি!' বলল নবী।

চট্ করে ওদিকে চাইল রানা। ভিডিও স্ক্রিনে দেখা গেল ক্যামেরা, গোপন মেশিনগানের নীচে। এইমিং রেফারেন্স দেবে নবীকে। নীচে নেমে গেল মেশিনগান, বাম্পারের তলা থেকে বেরুল ব্যারেল।

'জলদি, নবী!' তাড়া দিল রানা।

কি-বোর্ডে টোকা দিল ক্যাপ্টেন। বিশ্রী খ্যাট-খ্যাট আওয়াজ শুরু হলো, মৃদু কাঁপতে লাগল পুরো ট্রাক। ক্যাবের নীচ থেকে বেরুল কমলা আগুনের শিখা। সামনে রাস্তার পিচ বিস্ফোরিত হলো। ঘুরেই বামদিকে ছুটতে চাইল লোকটা, তবে বেশি তাড়াহুড়ো করেছে। বাম গোড়ালির ভিতর ঢুকল দুটো গুলি। অন্যগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে দিল গোটা দেহ। মেশিনগান থেকে প্রতি মিনিটে বেরোয় চার শ' গুলি। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে অ্যাসফল্টের উপর চিত হয়ে পড়ল লোকটা। যেন হামলা করেছে সিংহ, খাবলে নিয়ে গেছে বুকের মাংস।

যে লোকটা এইমাত্র ওই পরিবারটাকে খুন করেছে, মূর্তির মত জায়গায় জমে গেল সে। ট্রিগার থেকে আঙুল তুলেছে নবী, ব্যারেল তাক করেছে সিভিলিয়ান গাড়ির বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দ্বিতীয় লোকটার দিকে। অজস্র বুলেট বিঁধল তার গায়ে, শরীর ভেদ করে বিস্ফোরিত করল উইণ্ডশিল্ড ও পাশের জানালা। স্টিলের বডিতে ঠকাঠক লাগল বুলেট। দুই চাকা ফেটে যেতেই নিচু হয়ে বসে গেল গাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড মন্ত্রমুগ্ধের মত আধ খোলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অবস্থাটা বুঝে নিল খুনি লোকটা। টের পেল, এখন এখানে থাকা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। ধপ করে পড়ল সে রাস্তার উপর, খানিক দূরেই তার ক্রুজার, হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল গাড়ির সামনের চাকার আড়ালে। এবার বৃষ্টির মত ক্রুজারের দিকে আসতে শুরু করল বুলেট।

আপাতত আশ্রয় ছাড়বে না লোকটা।

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ক্রুজারের দিকে চলল রানা। খুনি প্রায় উঠে পড়েছে সামনের সিটে, কিন্তু তার উপর পড়ল সুন্দরীর শক্তিশালী হ্যালোজেন বাতি। দিন হয়ে গেল গাড়ির ভিতরের অংশ। টার্গেট পেয়েও হারাল নবী। পিস্তল উঁচু করে দ্রুত ট্রিগার টিপছে খুনি। কিন্তু ট্রাকের পুরু আর্মারে একটা বুলেটও বিঁধল না।

শীতল রাগ ছাড়া কিছু নেই রানার মনে। সোজাসুজি চলল গাড়িটার দিকে। 'শক্ত হয়ে বসো সবাই,' চাপা স্বরে বলল।

দু' সেকেণ্ড পেল রায়হান-স্বর্ণা-নিশাত, তারপর ক্রুজারের উপর চড়াও হলো ট্রাক। শুরু হলো ভয়ঙ্কর ধাতব মুড়মুড়ে আওয়াজ। ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল ক্রুজারের দরজা। চ্যাপ্টা করে দিল লোকটাকে। তার বাম পা ও কব্জি কাটা পড়েছে ডোর ফ্রেমে। একটা গুলি ঢুকল কপালে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে হেঁচড়ে চলল ক্রুজার, চাকাগুলো পিচের উপর হোঁচট খেল। তারপর কাত হয়েই চিত হয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে।

'প্রথম ক্রুজার, মাসুদ ভাই!' পিছন থেকে বলল স্বর্ণা।

চতুর্থ লোকটা অন্ধকার থেকে দৌড়ে এসে ঢুকে পড়েছে ক্রুজারের ভিতর, বোধহয় পুলিশ স্টেশনে রেডিও করতে চাইছে। ট্রাক ঘুরিয়ে মেশিনগান তাক করার সময় নেই। সিটের পাশের পকেট থেকে ওয়ালথার বের করে পিছনে স্বর্ণার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

ওটা ডানহাতে নিল লেফটেন্যান্ট, বাম হাতে নামাচ্ছে বুলেট প্রুফ জানালার কাঁচ। সেফটি ক্যাচ নামানো হতেই জানালা দিয়ে বের করল ওয়ালথার। ফিল্ড অভ ফায়ার দেয়ার জন্য উবু হয়ে গেল নিশাত সুলতানা।

তবে সঠিক অ্যাংগেল পেল না স্বর্ণা, গানম্যানকে পাওয়ার জন্য জানালা দিয়ে কোমর পর্যন্ত বের করে দিল। বামহাতে শক্ত

করে ধরেছে বড়সড় সাইড মিরর। পরক্ষণে গুলি করল। এত দ্রুত ট্রিগার টিপছে, যেন একের পর এক পটকা ফুটছে।

স্বর্ণাকে সাবধান করতে চাইল রানা, এই চেক পয়েন্টে আরও কেউ থাকতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে বলবার আগেই দেখা গেল একটা বালির ঢিবি থেকে ছুটে আসছে পঞ্চম লোকটা দু' হাতে ধরেছে মেশিন পিস্তল। তবে দূরত্বের কারণে লক্ষ্যভেদে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো সে। ওই অস্ত্র প্রতি মিনিটে পাঁচ শ' রাউণ্ড বর্ষণ করে, ঠিক চার সেকেণ্ড লাগল ম্যাগাজিন খালি হতে। ট্রাকের উইণ্ডশিল্ড ও আর্মারে লেগে ছিটকে গেল বুলেট। কাঁচের উপর তৈরি হয়েছে কয়েকটা খুদে নক্ষত্র। স্বর্ণার উপর দিয়ে ভিতরে ঢুকল একটা রাউণ্ড, এখানে-ওখানে ঠোকর খেয়ে থামল ওর মাথার ঠিক পাশে, ট্রাকের জানালার ফ্রেমে। ইস্পাতের চল্টা উঠল ওখান থেকে, লাগল নিশাতের ঘাড়ে। ওই শ্র্যাপনেল একটু এদিক-ওদিক গেলে কাটা পড়ত জাগিউলার ভেইন।

বামহাতে ঘাড় চেপে ধরল নিশাত, ডানহাতে শক্ত করে ধরেছে স্বর্ণার গোড়ালি পড়তে দেবে না। বনবন করে হুইল ঘোরাল রানা, মেশিন পিস্তলওয়ালার এপাশে রাখতে চাইছে ট্রাকের বাম পাশ। ফলে রাস্তার উপর পড়ার উপক্রম করল স্বর্ণা। ওকে দ্রুত টেনে নিল নিশাত।

'আপনার গুলি লেগেছে, আপা!' সোজা হয়ে বসেই জানতে চাইল স্বর্ণা। এইমাত্র দেখেছে রক্তে ভেজা নিশাতের হাত। 'কোথায় লাগল?'

'ঘাড়ে। আলু ছিলতে গিয়ে হাত কাটলেও এর চেয়ে বেশি রক্ত বের হয়,' নির্বিকার স্বরে বলল নিশাত। তবে স্বর্ণা সিটের নীচ থেকে ফার্স্ট এইড কিট বের করছে দেখে আপত্তি তুলল না।

রানা ঘুরিয়ে নিয়েছে ট্রাক, সুযোগ করে দিল মেশিনগান ব্যবহার করবার। কয়েক সেকেণ্ড বাড়তি এনে দিয়েছে স্বর্ণা।

চতুর্থ লোকটা লুকিয়ে পড়েছে ক্রুজারের আড়ালে, দুই হাতে খুঁজছে রেডিওর মাইক।

সুযোগ পেয়ে মেশিনগান চালু করল নবী। ড্রাইভারের কম্পার্টমেন্টের দিকে খেয়াল নেই। ওদিকটা দুর্গের মত। তার বদলে বেছে নিয়েছে ক্রুজারের পিছন অংশ। অজস্র বুলেট বিঁধল ট্যাঙ্কে, সঙ্গে সঙ্গে ছলকে বেরিয়ে এল গ্যাসোলিন। মেশিনগানের প্রতিটি সপ্তম রাউণ্ড ম্যাগনিযিয়াম-টিপড ট্রেসার, এক সেকেণ্ড লাগল অকটেনের পুকুরে আগুন ধরতে। ক্রুজারের নীচে তৈরি হলো আগুনের বিশাল কুণ্ডলি। হুউশ্ শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। ক্রুজারের পিছন অংশ অ্যাসফল্ট থেকে উপরে উঠল।

অবস্থা বেগতিক দেখে রেডিওর পিছনে সময় নষ্ট না করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে খুনি লোকটা, মরুভূমির দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে। তবে অনেক দেরি করে ফেলেছে।

অকটেন ও বাতাসের কারণে বিস্ফোরিত হলো গ্যাস ট্যাঙ্ক। প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল চারপাশ। দশ ফুট উপরে উঠল ক্রুজার, পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে নেমে এল বড়সড় উল্কার মত। রাস্তার পাশে বালির উপর পড়ল ওটা, পলায়নরত পুলিশের এক ফুট দূরে। আগুন ও ধুলো ঘিরে ধরল লোকটাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর ধুলো সরে যেতে দেখা গেল, মশালের মত জ্বলছে তার পোশাক। ধপ করে বালির উপর পড়ল সে, নিভাতে চাইছে আগুন। কিন্তু সারা শরীর অকটেনে ভেজা, নিভবে কেন। আগুনের ভিতর ছটফট করতে লাগল ডাঙায় তোলা মাছের মত।

দয়া করল নবী, এক সেকেণ্ডের জন্য ট্রিগার টিপল।

'পঞ্চম লোকটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'মনে হলো মরুভূমির দিকে ছুটছে,' বলল নিশাত। ওর ঘাড়ে গজ প্যাড আটকে দিয়েছে স্বর্ণা, পরিষ্কার করছে হাত।

মনে মনে কপালের দোষ দিল রানা। এখন হোক বা একটু

পর কোনও না কোনও গাড়ি আসবে, কাজেই সাক্ষী রাখা চলবে না। হুইল ঘুরিয়ে সড়ক থেকে মরুভূমিতে নামল রানা। কঠিন সাসপেনশন সহজেই বালির উপর দিয়ে নিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড ট্রাককে। দেখতে না দেখতে গতি উঠল চল্লিশ মাইলে। হ্যালোজেন বাতির কারণে পরিষ্কার চোখে পড়ল লোকটার পদচিহ্ন। প্রাণপণে ছুটে চলেছে।

লোকটাকে খুঁজে বের করতে মাত্র এক মিনিট লাগল, ভীত খরগোশের মত ছুটছে সে। পিছন থেকে তেড়ে আসছে বিশাল ট্রাক, তারপরও আত্মসমর্পণ করছে না। দৌড়ে চলেছে। তার ঠিক পিছনে পৌঁছে গেল রানা। পিঠের কাছে ইঞ্জিনের গরম অনুভব করে ঘাড় কাত করে চাইল, তারপর নতুন উদ্যমে ছুটতে লাগল।

'একে নিয়ে কী করব আমরা?' জানতে চাইল নবী। চিন্তিত।

কোনও জবাব দিল না রানা। মানুষের নানা ধরনের মৃত্যু দেখেছে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করতে চায় না। প্রার্থনা করছে, লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি শুরু করুক।

কিন্তু তা করবে না সে। হাত থেকে পড়ে গেছে অস্ত্র।

অন্য উপায় বের করতে হবে। পিছু নিয়ে চলেছে সুন্দরী। তিন ফুট সামনে লোকটা।

ঘাড়ের কাছে প্রকাণ্ড ট্রাক ভীত করে তুলেছে তাকে, হঠাৎ করেই ডজ দিয়ে অন্য দিকে সরতে চাইল—কিন্তু নরম বালিতে সড়াৎ করে পিছলে গেল বাম পা। ব্রেক কষল রানা, একই সঙ্গে বনবন করে ঘোরাল হুইল। চাইছে না ট্রাক লোকটার উপর উঠুক। দু' সেকেণ্ড পর থামল যন্ত্রদানব। তার আগেই বিশ্রী ঝাঁকি লাগায় টের পেল ওরা কী ঘটেছে।

সাসপেনশনের দুলুনি থামবার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। এক পলক দেখল দেহটা। যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে। আবারও উঠল ক্যাবে, গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর মনে পড়ল লোকটা

ট্রাকের দিকে গুলি করছিল। জানালা থেকে ঝুলছিল স্বর্ণা। ঘাড়ের উপর ক্ষত তৈরি হয়েছে নিশাতের। কিন্তু এসব ভেবে মন থেকে দূর করতে পারল না লোকটার এই পরিণতি। আবার সড়কে এসে উঠল সুন্দরী, সিভিলিয়ান গাড়ির সামনে গিয়ে থামল। এখনও জ্বলছে একটা পুলিশ ক্রুজার।

স্বর্ণার কাছ থেকে ওয়ালথার নিল রানা, নতুন ম্যাগাজিন ভরে টেনে নিল স্লাইড। অস্ত্র হাতে ক্যাব থেকে নামল, চার দিকে নজর রেখেছে। চলে গেল প্রথম ক্রুজারের পাশে। ওটার ভিতর থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিল রেডিওর মাইক্রোফোন, ছুঁড়ে মারল মরুভূমির দিকে। এখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না কেউ। দ্বিতীয় ক্রুজারের ভিতরের মাইক্রোফোন প্লাস্টিকের কাদা হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

ফ্যামিলি সেডানের পাশে থামল রানা, একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিতরে চাইল। গাড়ির ভিতর রক্তের আঁশটে গন্ধ। স্বামী-স্ত্রী ও দুই বাচ্চা, চারজনই মারা গেছে। একমাত্র সান্ত্বনা: এদের আঘাত ছিল গুরুতর, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে।

এসব অহেতুক মৃত্যু সবসময় ছোট করে দেয় মনটা। পরিবার কর্তার কোলে সরু ওয়ালেট দেখল রানা, ওটা তুলে নিল। ড্রাইভারের নাম আলী আহাম্মেদ। ত্রিপোলিতে থাকত। আইডি কার্ড অনুযায়ী সে হাই-স্কুলের শিক্ষক। মানিব্যাগে মাত্র কয়েকটা দিনার।

হঠাৎ রানার মনে হলো পাঁচ দুর্নীতিবাজ পুলিশ মারা যাওয়ায় কারও ক্ষতি হয়নি।

এই তরুণ পরিবার মরল, কারণ তারা গরীব ছিল, যথেষ্ট ঘুষ দিতে পারেনি।

তেরো

লিবিয়ার এদিক মরুভূমিময় রুক্ষ প্রান্তর ও উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকা। চারপাশে বড়বড় বোল্ডার। একটানা সাত ঘণ্টা চলছে সুন্দরী। অনেক আগেই দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশাত। এর ভিতর রানাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে স্বর্ণা ও নবী, ট্রাক চালাবে ওরা; কিন্তু রাজি হয়নি রানা। ওর মনে জেঁকে বসেছে নানা ভাবনা।

পাহাড়ি মরুভূমির ভিতর দারুণ রুট বাছাই করেছে রায়হান। কোনও সমস্যা না করে চলছে ডক্টর শামশের আলীর প্রিয়তমা। খাড়াই জমি বেয়ে উঠতে সামান্যতম আপত্তি তুলছে না ইঞ্জিন। চূড়া থেকে নেমে যাওয়ার সময় ঠিক ব্রেক কষছে। ডক্টর পিছন চাকাগুলোর পর বসিয়েছেন এক সারি চেইন। ওগুলো জমিতে আঁচড় বুলিয়ে চলেছে। চাকার চিহ্ন থাকছে না।

কারও বুঝবার কথা নয় ওরা চেক পয়েন্ট থেকে এদিকে এসেছে। তারপরও তাড়া অনুভব করছে রানা। হাইওয়েতে কী ঘটেছে বুঝবে লিবিয়ান কর্তৃপক্ষ। ওই পুলিশ অফিসাররা ঘুষখোর হোক বা না হোক, তাদের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে চাইবে তারা।

মার্ভেল থেকে নিয়মিত আপডেট পাঠিয়ে চলেছে সোহেল। আমেরিকান নেভি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তীর থেকে তিরিশ মাইল দূরে এক স্কোয়াড্রন ই-২সি হওকি বিমান চক্কোর মারছে, নজর

রাখছে লিবিয়ান সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিমগুলোর উপর।

একটু আগে ভোর হয়েছে। তার মানে লিবিয়ান সার টিমগুলোর এয়ারক্রাফট আকাশে উঠে পড়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এদিকে আসেনি। সমস্ত মনোযোগ ক্র্যাশ সাইট থেকে এক শ' মাইল দূরে।

'জিপিএস অনুযায়ী আর মাত্র দুই ক্লিক বাকি ক্র্যাশ সাইটে পৌঁছুতে,' বলল নবী। 'ট্রাক লুকাবার জন্য ভাল জায়গা বেছে নিয়েছে রায়হান।'

চারপাশ দেখে নিল রানা। ওরা আছে পাহাড়ের উপর এক উপত্যকায়, সাগর সমতল থেকে চার হাজার ফুট উপরে। কোনও গাছ জন্মেনি। ন্যাড়া পাথুরে জমিন। মাঝে মাঝে ঘাসের চাপড়া।

'বামে চলুন, মাসুদ ভাই,' বলল নবী। 'আর পাঁচ শ' গজ যেতে হবে।'

ওর দেখানো পথে চলল সুন্দরী, সামনে উঁচু জমি। তবে ঢাল বেয়ে উঠতে হলো না, চোখে পড়ল সরু পাথুরে ফাটল। আগেই স্যাটালাইট ইমেজে দেখেছে রায়হান। ফাটলটা যথেষ্ট গভীর ও চওড়া, অনায়াসে রাখা যাবে ট্রাক। আকাশ থেকে সরাসরি না তাকালে আশপাশ থেকে কেউ বুঝবে না।

'ভাল জায়গা,' বলল রানা। ফাটল দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ট্রাক, খানিকদূর গিয়ে থামল। সুন্দরীর ট্যাঙ্কে এখনও দুই তৃতীয়াংশ ফিউয়েল রয়েছে। ডক্টর শামশের আলী যতটা ভেবেছেন, তার চেয়ে ঢের ভাল করছে তাঁর প্রেমিকা।

ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন থেমে যেতেই চারপাশ থমথম করতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল ওরা নিথর নীরবতায়।

'আমরা পৌঁচেছি?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল নিশাত।

'প্রায়,' বলল স্বর্ণা। 'এবার উঠুন, আপা।'

হাই তুলে সোজা হয়ে বসল নিশাত, হাত বাড়িয়ে টিপে দিল

গোপন এক সুইচ। কিরকির আওয়াজ তুলে সরে গেল পিছনের দেয়াল, বেরিয়ে এল কার্গো হোল্ড। এ মিশনের জন্য যথেষ্ট কম গিয়ার এনেছে ওরা। সাবমেশিন গান ও গ্রেনেড লঞ্চার ছাড়া রয়েছে চারটে ন্যাপস্যাক। তার ভিতর প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট। ব্যাগগুলো বিলি শুরু করল নিশাত। নিজেরটা নিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রানা, টের পেল শিরশির করছে মেরুদণ্ড।

খাতের ভিতর অংশে গাঢ় ছায়া, কিন্তু বাতাস গরম ও শুকনো। নাকে এল ধুলোর গন্ধ। আন্দাজ করা কঠিন এ অঞ্চলে বাস করে মানুষ। কিন্তু হাজারো বছর ধরে সাহারা মরুভূমিতে টিকে রয়েছে তারা। এ থেকে বোঝা যায় সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয় মানুষ।

কয়েক মুহূর্ত পর রানার পাশে থামল সবাই। হাতের জিপিএস ডিভাইস পরীক্ষা করল নবী, তারপর উত্তর দিক দেখিয়ে দিল।

ট্রাকে প্রায় কোনও কথাই হয়নি ওদের। এখনও আলাপ করবার ইচ্ছে রইল না কারও। রানার পিছনে রওনা হয়ে গেল ওরা, উঠতে লাগল নামহীন এক টিলার উপর। সবার চোখে সানগ্লাস। সূর্য পুড়িয়ে দিতে চাইছে ঘাড়। হিপ পকেট থেকে রুমাল বের করে গলায়-ঘাড়ে বেঁধে নিল রানা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বদ্ধ পরিবেশে থাকবার পর এখন হাঁটতে অবশ্য ভালই লাগছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল এক পাহাড়ের ঢালে। এখানেই প্রথমবারের মত দেখা গেল বিমানের অংশ। অ্যালুমিনিয়ামের ট্র্যাশক্যানের মত দুমড়ে গেছে। ডানার ওই অংশ দেখে এভিয়েশন এক্সপার্ট বলবে, ওটা ফ্রন্ট গিয়ার এসেম্বলির হ্যাচের অংশ।

ঢালের উপর দিকে চাইল রানা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জঞ্জাল। টিলার চূড়ার কাছে ফিউজেলাজের বড় এক অংশ। মনে

হচ্ছে যেন এখান দিয়ে বয়ে গেছে ভয়ঙ্কর টর্নেডো।

আকাশ থেকে প্রায় খাড়াভাবে আছড়ে পড়েছিল বিমান। ভাঙা ফিউজেলাজ আগুনে পুড়ে যায়। নানাদিকে মুঠোর চেয়ে ছোট ধাতু ও প্লাস্টিকের টুকরো। নীচে পড়েই খুবলে নিয়েছে পাথুরে জমি, যেন দু' হাতে আঁচড় কেটেছে কোনও বিশাল দানব। এভিয়েশন কেরোসিন বিস্ফোরিত হয়ে পুড়িয়ে দেয় চারপাশের জমি। শুরু হয় দাবাগ্নি, তবে আশপাশে কোনও গাছ ছিল না বলে ঝোপঝাড় ও আগাছা জ্বালিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে।

এতক্ষণ পিছন থেকে এসেছে হাওয়া, ফলে পোড়া ফিউলের দুর্গন্ধ আসেনি। খানিক চলবার পর কেরোসিনের ভারী গন্ধে আটকে আসতে চাইল শ্বাস। কাপড় দিয়ে নাক ঢাকল ওরা, একটু কমল ফিউলের ধক।

চারদিক দেখবার জন্য ছড়িয়ে পড়ল সবাই। ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে বড় টুকরোগুলোর ছবি তুলছে নবী। বুঝতে চাইছে জিনিসটা কোথা থেকে এসেছে। ছিঁড়ে যাওয়া কয়েকটা বল্টু তুলে নিল, রেখে দিল প্লাস্টিকের ব্যাগে। এসব বল্টু কেবিনের মেঝেতে আটকে রাখত সিটগুলোকে। নবী এরইমধ্যে খুঁজতে শুরু করেছে বিমানের লেজ। ওদের দুই বন্ধুর ধারণা, ওটার কারণে ধ্বংস হয় বিমান। আর তাই যদি হয়, ওই জিনিস পাওয়া যাবে কয়েক মাইল দূরে।

'মাসুদ ভাই,' ডাকল স্বর্ণা। বাঁ দিকে চলে গেছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমানের সিএফএম ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনের পাশে।

দ্রুত পায়ে ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা। নীরবে জমির দিক দেখিয়ে দিল স্বর্ণা। ধুলোর ভিতর ডুবে আছে জিনিসটা।

হাত থেকে কাটা কবজি, বিশ্রী ভাবে পোড়া। থাবা দেখে বোঝা যায় পুরুষের। দু'হাতে লেইটেক্স গ্লাভস্ পরে নিল রানা, ঝুঁকে তুলে নিল হাতটা। ন্যাপস্যাক থেকে বের করল প্লাস্টিকের

টিউব, এক দিকের অংশ খুলে কাটা কব্জি থেকে রক্তের স্যাম্পল নিয়ে রেখে দিল এভিডেন্স কালেকশন টিউবে। লোকটার অনামিকা থেকে খুলে নিল আঙটি। পাতের ভিতর অংশে খোদাই করা কয়েকটা অক্ষর।

চোখ সরু করে পড়ছে স্বর্ণা। 'তানিমা ও সাদাত। ১/১/২০০৮ ইং।' রানার দিকে চাইল স্বর্ণা। 'বিবাহিত। আট সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন বিয়ে হয়। আমি প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্ট পড়েছি। সাদাত হোসেন ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল।'

একটু থমকে গেল রানা। ছেলেটি কয়েক বছর আগে যোগ দেয় বিসিআইয়ে। হাসিখুশি ছেলে। নিজের বিয়েতে দাওয়াত দেয়। নিজেই নিয়ে যায় ওদেরকে। খুব হুলুস্থুল করে বিয়ে করে প্রেমিকাকে।

দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল রানা। একটু আগে মনের ভিতর আশা ছিল: মানুষগুলো যেভাবেই হোক, বেঁচে থাকবে। কিন্তু এখন সব আশা শেষ। কেউ নেই। প্লেনের সবাই মারা গেছে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে চাইল রানা। গম্ভীর চেহারায় এদিকে আসছে নিশাত সুলতানা।

'পোর্ট ইঞ্জিনের এক অংশে আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগের টুকরো পেয়েছি। সিরিয়াল নম্বর মিলে গেছে। এটাই বাংলাদেশের বিমান এয়ারবাস।'

কোনও এভিয়েশন এক্সপার্ট টিম না আসা পর্যন্ত বোঝা যাবে না কী কারণে ভূ-পাতিত হয়েছে বিমান। এখন আর না খুঁজলেও চলে। রানা একবার ভাবল সবাইকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরবে, ওদের কারণে নষ্ট হতে পারে প্রমাণগুলো। কিন্তু মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান ওদের কাছ থেকে সব শুনতে চাইবেন। আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ওর মন বলছে, কাজ শেষ না করে

যাওয়া ঠিক হবে না।

'ঠিক আছে,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল। 'আমরা স্যাম্পল জোগাড় করব। তবে খুব সাবধান, কোনও প্রমাণ যেন নষ্ট না হয়।' নিজ পায়ের দিকে চাইল। ওদের সবার পায়ে ট্রেড ছাড়া সোল। কোনও ছাপ পড়বে না। বিচ্ছিন্ন হাতের অনামিকায় আঙটি পরিয়ে দিল রানা, ঠিক আগের মত করে রেখে দিল ধুলোর ভিতর।

একাই ফিউজেলাজের কাছে চলে গেছে নবী, সব খুঁটিয়ে দেখছে। তার পাশে চলে গেল রানা-স্বর্ণা-নিশাত। ফিউজেলাজের এই অংশ ছিল ককপিটের ঠিক পিছনে। এটার শেষ অংশে যোগ হয়েছে ডানা। পোর্ট সাইডে জানালা থাকার কথা, কিন্তু সব ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে অ্যালুমিনিয়ামের পাত। জায়গাটা বিশ্রীভাবে প্রসারিত ঠোঁটের মত লাগছে। এয়ারক্রাফট থেকে ঝুলছে কাটা পড়া তার ও হাইড্রলিক লাইন। টপটপ করে ফ্লুইড পড়েছে পাথুরে জমির উপর।

অনেক সামনে গিয়ে পড়েছে ককপিট। পাথুরে জমির ভিতর দশ ফুট গেঁথে গেছে এয়ারক্রাফটের নাক। ধাতব চামড়া দেখে মনে হয় অ্যাকর্ডিয়ানের ট্যাণ্ডেম বাসের জয়েন্ট।

ফিউজেলাজের ভিতর ঢুকল রানা। চমৎকার কেবিন পুড়ে ছারখার হয়েছে। মেঝের উপর প্লাস্টিকের স্তূপ। কংকালের মত ইস্পাতের ফ্রেম বলছে ওখানে সিট ছিল।

চট্ করে গুণল রানা, সব মিলে এগারোটা লাশ। সাদাতের হাতের মতই পুড়ে বিকৃত সবাই। কাউকে চেনা যায় না। ছাই হয়েছে পোশাক। থেঁতলানো পোড়া মাংস ছাড়া কিছুই নেই। প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়বার ফলে দেহগুলো চারদিকে ছিটকে পড়েছে। পোড়া মাংসপচা দুর্গন্ধ হারিয়ে দিয়েছে এভিয়েশন ফিউয়েলকে। হাজির হয়েছে কয়েক হাজার মাছি। কোনও লাশের পাশে থামলে

ভনভন করে উড়াল দিচ্ছে।

হঠাৎ রানার মুখে জমে গেল লালা, বমি আসতে চাইছে। ঢোক গিলে অন্য দিকে চাইল।

একটু দূরে একটা ক্লাব চেয়ারের নীচে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে মেঝে দেখছে নবী, দাঁতে ধরা ফ্ল্যাশলাইট। চারদিকের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও লাশ থেকে মনোযোগ সরাতে গুনগুন করে গান গাইতে চাইছে, কিন্তু হচ্ছে না কিছুই। যেন গুঙিয়ে চলেছে অসুস্থ কেউ।

'নবী,' ডাকল রানা। 'তোমার কাজ শেষ হলে, চলো বেরিয়ে যাই।'

মনোযোগ দিয়ে কী যেন করছিল, রানার কণ্ঠ শুনে চমকে গেল। মুখ থেকে টর্চ সরিয়ে উপরে চাইল। 'মাসুদ ভাই, বহুত বুদ্ধি খাটিয়ে নকল দৃশ্য তৈরি করেছে কেউ।'

'কী বলতে চাইছ?'

'এই ক্র্যাশ সাইট বোগাস। এখানে এসে আগেই প্রমাণগুলো সরিয়ে ফেলেছে কেউ।'

'বুঝলে কী করে? আমার কাছে তো সব স্বাভাবিক লাগছে।' রানার মনে পড়ল বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর এভিয়েশন অ্যাক্সিডেন্টের উপর একটা কোর্স করেছিল নবী।

'ক্র্যাশ ঠিক আছে। এটাই প্রধানমন্ত্রীর বিমান তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একদল লোক এখানে সব ওলটপালট করেছে।'

হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে এল রানা। 'আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

ওর দিকে না চেয়ে স্বর্ণার দিকে চাইল নবী। 'আপনি ধরতে পেরেছেন?'

'কী ধরব?' বলল স্বর্ণা। 'একটা বিমান ধ্বংস হয়েছে, মারা

গেছে সব ক'জন মানুষ—আল্লাহ জানেন, বাকি জীবন এই দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরবে কি না। আবার কী দেখব?'

'আপনার রুমালটা নাক থেকে সরান,' বলল নবী।

'মরতে?'

'যা বলছি করুন।'

'এর মাথা খারাপ,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা, তবে নাক থেকে সরাল রুমাল। খুব সাবধানে শ্বাস নিল। পরের মুহূর্তে বড় করে দম নিল। 'কিছুই তো বুঝলাম না?'

নিজের রুমাল সরাল রানা। দু'বার শ্বাস নেয়ার পর বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। ওর দিকে চেয়ে আছে নিশাতও।

'আমি যা পেয়েছি তা-ই কি পেলেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'জেলিড গ্যাসোলিন।'

'নাপামের মত,' তথ্য জুগিয়ে দিল নবী।

নিশাতও বুঝতে পেরেছে।

'আপনি নেভিতে আছেন, কাজেই বুঝবেন না, স্বর্ণা,' বলল নবী। 'এ জিনিস ব্যবহার করে না নেভি।'

'জিনিসটা পুরনো আমলের ফ্লেমথ্রোয়ারের মত,' বলল রানা।

'ঠিক তাই, মাসুদ ভাই,' বলল নবী। 'আমার ধারণা একদল লোক এই বিমানকে নামতে বাধ্য করে। সে এলাকা এখান থেকে দূরে। নামিয়ে নেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীকে। আবার আকাশে ওড়ে এয়ারবাস, তারপর এখানে এসে ক্র্যাশ করে পাহাড়ের উপর। হয়তো ব্যবহার করা হয় রিমোট কন্ট্রোল্ড সিস্টেম। আবার হতে পারে, ক্র্যাশ করিয়েছে আত্মঘাতী পাইলটকে দিয়ে।

'বিমান পড়ে যাওয়ার পর একদল লোক আসে, মরা পাইলটকে সরিয়ে নেয়। তখনই বুঝেছে ঠিক ভাবে পোড়েনি কেবিন। বাধ্য হয়ে ফ্লেমথ্রোয়ার ব্যবহার করেছে। আমরা যদি এই

গন্ধ না পেতাম, বাতাসে মিলিয়ে যেত। পরে কেউ বলতে পারত না প্রমাণ সরানো হয়েছে। বাংলাদেশি টিম স্যাম্পলগুলো অ্যানালাইয করবে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফে, কাজেই এভিয়েশন ফিউয়েল ছাড়া কিছুই ধরা পড়বে না।'

'আমাদের কোনও ভুল হচ্ছে না তো?' বলল স্বর্ণা।

'না,' জোর দিয়ে বলল নবী।

পরস্পরের দিকে চাইল ওরা সবাই।

মন বলছে রানার, আরেকটা সুযোগ পেয়েছে। এমন তো হতেই পারে প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

একটা কথা মনে পড়তেই নবীর দিকে চাইল স্বর্ণা। 'ক্যাপ্টেন নবী, আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব বিমান আগে নামানো হয়েছে? বিমান এখানে পড়বার পরেও ফ্লেমথ্রোয়ার ব্যবহার করতে পারে।'

'প্রমাণ থাকবে ল্যাণ্ডিং গিয়ারে,' বলল রানা। 'চলো, দেখি।'

ফিউজেলাজ ধরে এগুলো ওরা, নেমে এল অন্ধকারচ্ছন্ন কার্গো এরিয়ায়। বদ্ধ বাতাসে ভাসছে পোড়া ফিউয়েলের কটু গন্ধ। ওটা কয়েক দিনে পচা লাশের দুর্গন্ধের চেয়ে অনেক বেশি সহনীয়। মেঝের উপর বসানো অ্যাক্সেস প্যানেলের সামনে থামল নবী, খুলে ফেলল টগল। হ্যাচ তুলে দিতেই বেরিয়ে এল দীর্ঘ পিয়ানো হিঞ্জ। ফোকরের নীচে এয়ারবাসের প্রকাণ্ড চাকা ও পোর্ট সাইড ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একবার রানার দিকে চেয়ে গর্তের ভিতর নেমে পড়ল নবী, চাকার নীচের অংশে ফেলল ফ্ল্যাশলাইট। হামাগুড়ি দিয়ে এড়িয়ে গেল চাকা, নাক থাকল রাবার থেকে আধ ইঞ্চি দূরে। 'কিছুই নেই,' বলল। আরও নিচু হয়ে দেখতে চাইল অন্য চাকাগুলো।

এক মিনিট পেরুল, তারপর গর্ত থেকে উঠে এল। রানার দিকে মেলে ধরেছে ডান হাত। 'এই যে আমাদের প্রমাণ, মাসুদ ভাই।'

'একটা বিচ্ছিরি পাথর?' আপত্তির সুরে বলল স্বর্ণা।

'চাকার ট্রেডের ভিতর ছিল, নীচের হ্যাচে পাবেন বালি,' বলল নবী। 'এই বিমান রওনা হয়েছে নিউ ইয়র্ক থেকে। তারপর লিবিয়ার এই পাহাড়ে এসে ক্র্যাশ করেছে। তা হলে মাঝখান থেকে কোত্থেকে এল স্যাণ্ডস্টোন আর বালি? এই জিনিস নিউ ইয়র্কে মিলবে না। তবে আছে লিবিয়ায়।'

মাথা দোলাল রানা। 'প্রমাণ হয়েছে বিমান নামানো হয়েছে মরুভূমিতে।' পাথরের খণ্ড বাড়িয়ে দিল নবীর দিকে। 'এক্সপার্টরা এটা না-ও দেখতে পারে। তবে মার্ভেলে অ্যানালাইয করা যায়।'

হঠাৎ কোত্থেকে যেন এল আওয়াজটা। অজান্তে মাথা নিচু করে নিল ওরা। এইমাত্র ফিউজেলাজের উপর দিয়ে গেছে প্রকাণ্ড এক হেলিকপ্টার। এত নীচ দিয়ে গেছে, শুরু হয়েছে বালিঝড়। শব্দ এসেছে উত্তর-পুব থেকে। ওদিকেই ত্রিপোলি শহর। শহরের বাইরের অংশে রয়েছে লিবিয়ান মিলিটারি বেস। আমেরিকান নেভির অ্যাওয়্যাক্স বিমানকে ফাঁকি দিতে কপ্টার মাটি ছুঁয়ে এসেছে।

আগে নড়ে উঠল রানা, তারপর অন্যরা। দেরি না করে কার্গো এরিয়া হয়ে কেবিনে ঢুকল ওরা, বেরিয়ে এল ফিউজেলাজ থেকে। দূর আকাশে স্থির হয়ে আছে রাশান এমআই-৮ কার্গো কপ্টার, বোধহয় নামবে। প্রকাণ্ড এই ফড়িং প্রায় পাঁচ টন ওজন নেয়। টারবাইনের আওয়াজ বদলে গেল, ভাঙা ফিউজেলাজ থেকে পাঁচ শ' গজ দূরে নামতে লাগল টিলার উপর।

'নতুন করে প্রমাণ হলো এরা জানত বিমান কোথায় ক্র্যাশ করেছে,' বলল স্বর্ণা। চেয়ে রইল খাকি রং করা কপ্টারের দিকে। 'পাইলট ভাল করেই জানে কোথায় নামতে হবে।'

'এসো, ধুলো নেমে যাওয়ার আগেই কাভার পেতে হবে,' পা বাড়াল রানা। সবাইকে নিয়ে চলেছে ফিউজেলাজের অপর পাশে।

ফিউজেলাজের আশপাশে কোনও আড়াল নেই। হালকা চালে দৌড়াতে শুরু করল বাংলাদেশি টিম, নেমে চলেছে টিলা বেয়ে। খানিক ছুটবার পর শীর্ণ এক ড্রাই ওয়াশ পড়ল। পাহাড়ে তুমুল বৃষ্টির সময় এটা হয়ে ওঠে গভীর এক ঝর্না। এখানে থামল ওরা, শুয়ে পড়ল রানার নির্দেশে। মুঠো মুঠো বালি ছড়িয়ে দেহগুলো আড়াল করে দিল রানা। যতটা পারে নিজেও লুকিয়ে পড়ল। খুব বেশি ভাবছে না। সরে এসেছে ওরা, তা ছাড়া কপ্টার থেকে এত দূরে কারও আসবার কথা নয়।

'মাসুদ ভাই, আপনার কী ধারণা? ওরা ওখানে কী করছে?' ফিসফিস করে বলল নবী।

'জানি না। আপা, স্বর্ণা, তোমাদের কী মনে হয়?'

'আল্লাহ মাবুদ জানেন,' বলল নিশাত।

'কেউ হয়তো ভেবেছে ঠিক করে স্টেজ সাজানো হয়নি,' বলল স্বর্ণা। 'কাজেই নতুন করে নিখুঁত করতে এসেছে।'

চূড়ার কাছে নেমেছে কপ্টার। থামছে টারবাইন। কমে এল রোটরের গতি। সিলিং ফ্যানের মত ছড়িয়ে দিল হাওয়া। তারপর লেজের বুম থেকে খানিক নীচে খুলে গেল শ্যামুকের মত দরজা। একেকবারে নেমে এল তিনজন করে লোক, পরনে ডেজার্ট ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম। প্রত্যেকের মাথায় লাল-সাদা কাফিয়ে। মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম জঙ্গিরা শখ করে ব্যবহার করে ওটা।

'রেগুলার আর্মি, না গেরিলা?' জানতে চাইল নিশাত।

প্রায় এক মিনিট চেয়ে রইল রানা, তারপর বলল, 'চারপাশে যেভাবে ঘুরছে, মনে হয় না রেগুলার আর্মি। এরা সৈনিক হলে প্যারেড ফরমেশনে নেয়া হতো। জানি না লিবিয়ান মিলিটারির মার্কিংওয়ালা কপ্টার এখানে কী করছে।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছে ওরা, ক' মুহূর্ত পর বিস্ফারিত হলো ওদের চোখ। দুই লোক পিছন হেঁটে বেরিয়ে এসেছে কপ্টার

থেকে, রাশ ধরে টেনে আনছে একটা উটকে! প্রাণপণে পিছিয়ে যেতে চাইছে প্রাণীটা, থরথর করে কাঁপছে চার পা। বিকট স্বরে আপত্তি তুলছে, গ্যাঁজলা ওঠা ফেনা পড়ছে লোক দুটোর মুখের উপর। তারপর ডানদিকের লোকটার উপর বমি করে দিল উট। আকাশ পথে আসবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দুই পশুচারকের দিকে চেয়ে হো-হো করে হাসছে অন্যরা। এত দূরেও পৌঁছে গেল সেই আওয়াজ।

'কী করছে ওরা?' আনমনে বলল নবী। 'দেখে তো মনে হয় ওই উট আধ-মরা।'

মনে মনে সায় দিল রানা। সুস্থ লাগছে না জন্তুটাকে। জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে লোমগুলো, কেমন ম্লান বর্ণের। এক দিকে কাত হয়ে গেছে কুঁজ, আকৃতি স্বাভাবিকের অর্ধেক। কী ঘটে চুপচাপ দেখছে রানা।

একুশজন লোক নেমে এসেছে কপ্টার থেকে, জঞ্জাল ভরা ঢালে ঘুরে দেখছে। উট নিয়ে যে দু'জন হাঁটছে, তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে চারপাশে হাঁটাহাঁটি করছে। কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরছে কপ্টারের কাছে। পরে ছাপ দেখলে মনে হবে ওখানে একাধিক উট ছিল। রানা খেয়াল করল লোকগুলোর কারও কারও পায়ে চামড়ার স্যাণ্ডেল। এবার নিশ্চিত হয়ে গেল ও।

'স্বর্ণার কথা ঠিক। ওরা ভেবেছে ফরেনসিক টিম ক্র্যাশ সাইট দেখলে বহু কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। তাই এখন প্রমাণ-নষ্ট করছে। এমন ভাব নিয়েছে, ওরা একদল যাযাবর।'

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলল এসব। হাতের কাছে যা পেল, লোকগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। ছুঁড়ে ফেলে দিল এদিক ওদিক। দু'জনের হাতে স্লেজহ্যামার। ওগুলো দিয়ে বড় টুকরোগুলোকে পেটানো হলো। ককপিট ও ফিউজেলাজের তার এবং মাঝারি অংশগুলো নিয়ে ফেলা হলো দুই শ' গজ দূরে। বুঝবার উপায়

রইল না বিমান কীভাবে পড়েছে। ল্যাণ্ডিং গিয়ার ডোর খুলে বের করা হলো বিশাল চাকাগুলো। রাইফেলের গুলিতে ফুটো হলো সব। বিমানের কিছু অংশ টেনে নেয়া হলো কপ্টার পর্যন্ত, তুলে দেয়া হলো ফড়িঙের পেটে। জায়গা ভরে যেতেই রওনা হলো ওটা। সঙ্গে গেল চারজন। পঁচিশ মিনিট পর আবারও ফিরল কপ্টার। বিমানের টুকরো ফেলে আসা হয়েছে মরুভূমির ভিতর।

আগেই বিমানের ধ্বংসাবশেষ ছিল অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল ও প্লাস্টিকের জঞ্জাল, কিন্তু এখন যে অবস্থা, ক্র্যাশ এক্সপার্টরা এসব থেকে কিছুই বুঝবে না। লাশগুলোকে খানিক দূরে নিয়ে পুঁতে ফেলা হলো। জ্বলে উঠল কয়েকটা আগুন। পরে কেউ এলে ভাববে এখানে ক্যাম্প করেছিল একদল যাযাবর, কমপক্ষে দু'দিন ছিল এখানে। উটের কাজ শেষ। ওটা যে লোকের উপর বমি করেছে, সে পিস্তল বের করে জন্তুটার দুই চোখের মাঝখানে গুলি করল।

এর কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হলো সবাই। কয়েকজন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মনে হয় প্রকৃতির ডাকেই। কাজ শেষে কপ্টারে উঠে বেসে ফিরবে।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা। 'আমার কথা মন দিয়ে শোনো, ট্রাক নিয়ে তিউনিশিয়া সীমান্তে পৌঁছবে তোমরা। তবে তখনই সাগরের দিকে যাওয়ার দরকার নেই। আমি সোহেলের মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ওকে জানিয়ে দিয়ো আমরা কী দেখেছি। ও যেন আমাকে ট্র্যাক করে।'

মার্ভেলের অপারেটিভদের উরুতে অপারেশন করে বসানো হয়েছে ট্র্যাকিং চিপস। ওটা দেহের নড়াচড়া থেকে শক্তি পায়। ছ' মাসে একবার ট্র্যান্সডারমাল রিচার্জ করলেই চলে। জিপিএস টেকনোলজিকে ব্যবহার করে জিনিসটা, ফলে অনায়াসে জানা যায় ওরা কে কোথায় আছে।

'আর আপনি কী করবেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'আমি ওদের সঙ্গে যাব।'

'আমরা তো জানিই না এরা কারা।'

'তা-ই তো যেতে হবে।'

ওই দলের এক লোক এসেছে শ' খানেক গজ দূরে। উচ্চতা ও আকৃতি প্রায় রানার মতই। তাকে দেখেই বুদ্ধি এসেছে রানার মাথায়। ভাষা নিয়ে সমস্যা হবে না। আর মুখ-মাথা ঢেকে রাখবে কাফিয়ে দিয়ে। আশা করা যায় অনায়াসে এ দলের সঙ্গে যাওয়া যাবে।

সুন্দরীর চাবি নিশাতকে দিল রানা, গোপন অবস্থান থেকে খুঁড়ে তুলছে নিজেকে। ওর বাহু স্পর্শ করল স্বর্ণা। 'মাসুদ ভাই, যার বদলে যাবেন, তার কী করব?'

'ফেলে যাবে। আমার ধারণা আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর লিবিয়ান সরকার ঘোষণা দেবে: আমরা বিমান খুঁজে পেয়েছি। তারপর এখানে ছুটে আসবে তাদের লোক। ও-ই ভেবে বের করুক কী ব্যাখ্যা দেবে তাদের।'

ড্রাই ওয়াশ থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল রানা, খানিক যাওয়ার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল। এক মিনিট পেরুনোর আগেই পৌঁছে গেল লোকটার পিছনে। কিছুই সন্দেহ করেনি সে। ঘুরতে শুরু করেছে কপ্টারের টারবাইন। পায়ের আওয়াজ পাওয়ার কথা নয়, আওয়াজটা এমনই তীক্ষ্ণ, দাঁতে দাঁত পিষতে হয়।

ছোট এক ঢিবির পিছনে অপেক্ষা করল রানা। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে লোকটা, গুলতির মার্বেলের মত পাথর তুলল পবিত্র হতে। দেরি করল না রানা, হাতে তুলে নিয়েছে ক্রিকেট বলের সমান একটা পাথর, পৌঁছে গেল শেষ দু'গজ। তখনই চট করে ঘুরে চাইল লোকটা। তার মাথার তালুর উপর জোরেসোরে নেমে

এল পাথর। রানার মনে পড়ল, ক'দিন আগে এক সোমালিয়ানকে এভাবে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল। তবে এ রীতিমত ভদ্রলোক, ঘুরেই ধুপ করে পড়ল বালির উপর।

বসে পড়ে লোকটার ঘাড়ে পালস দেখল রানা, জ্ঞান ফিরলে ব্যথা ছাড়া আর কোনও সমস্যা থাকবে না এর। দ্রুতহাতে তার পোশাক ও বুট খুলল রানা। কাফিয়ে খুলতেই দেখা গেল লোকটার বয়স ত্রিশ মত। ইউনিফর্মের পকেটে কোনও আইডেন্টিফিকেশন বা মানিব্যাগ নেই। কোনও ধরনের লেবেল রাখা হয়নি।

পোশাকগুলো নিজে পরে নিল রানা, অচেতন বন্দিকে ক্র্যাশ সাইট থেকে আরও খানিক সরিয়ে নিল। একবার পকেট থাবড়ে দেখল স্যাটালাইট ফোনটা আছে। ওটা না থাকলে এই পরিকল্পনা নিয়ে এগোত না। লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল, তারপর আধ মিনিট পেরুনোর আগেই শুনল চিৎকার। কপ্টারের আওয়াজের উপর দিয়ে ডাকছে এক লোক।

'সোবহান! সোবহান! জলদি!'

এ লোকের নাম সোবহান, তার বদলে চলেছে নিজে, দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল রানা। কাফিয়ে দিয়ে ভাল ভাবে ঢেকে নিয়েছে মুখ। ঢিবির আড়াল থেকে বেরুল। বিশ জনের এ দলের নেতা দাঁড়িয়ে রয়েছে কপ্টার থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। হাতের ইশারা করল, এক্ষুণি এসো।

মাথা দোলাল রানা, হালকা চালে ছুটতে লাগল।

'আর এক মিনিট দেরি হলে তোমাকে ফেলে যেতাম কাঁকড়া বিছের পাহাড়ে,' রানা কাছাকাছি পৌঁছতেই বলল সে।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'চাপ বেশি ছিল।'

'উঠে পড়ো।' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল লোকটা।

দু'জন পাশাপাশি উঠল কপ্টারে। কার্গো কম্পার্টমেন্টে দু' দিকের জানালার পাশে ফোল্ড করা সিট। অন্যদের চেয়ে খানিক পিছনে বসল রানা। খুশি, এরা মুখ থেকে সরায়নি কাফিয়ে। উষ্ণ অ্যালুমিনিয়ামের দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজল।

ওর জানা নেই রেগুলার মিলিটারির সঙ্গে রয়েছে, না সন্ত্রাসী জঙ্গিদের সঙ্গে। এখন কী-ই বা যায় আসে? যদি শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়ে, মরতে হবে। কাদের হাতে মরছে, তা জেনে কী হবে?

এক মিনিট পেরুনোর আগেই আকাশে উঠল কপ্টার।

চোদ্দ

ক' দিন হলো পাথুরে সেলে বন্দি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এ মুহূর্তে চুপ করে বসে আছেন মেঝেতে। কিছুই করবার নেই তাঁর, সঙ্গে কেউ নেই যে কথা বলে সময় কাটাবেন।

সেলে কোনও আসবাব নেই। বিছানা হিসাবে দেয়া হয়েছে চটের ছালা। একদিকে লোহার দরজা। ওদিক দিয়ে দেয়া হয় অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটি। খাবার অতি নিম্ন মানের। ছাতে দিনরাত জ্বলে নগ্ন বালব। প্রধানমন্ত্রীর ঘড়িটা কেড়ে নিয়েছে ওরা। কাজেই জানার উপায় নেই এখন দিন না রাত। তবে আঁচ করেন, এখানে আছেন চারদিন ধরে।

মরুভূমিতে এয়ারবাস ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিঙের আগে, ইন্টারকমে ব্যাখ্যা দেন পাইলট: তাঁরা পুরনো এক এয়ারফিল্ড দেখতে পেয়েছেন। বিমান অনেক নেমে এসেছে, তবে দুই মাইল যেতে পারবে।

রুক্ষ ধুলোময় স্ট্রিপে নামবার সময় খুব ঝাঁকি খেয়েছে বিমান, তবে পুরো আস্ত থেকেছে। চাকা থেমে যাওয়ার পর হৈ-হৈ করে পাইলটের প্রশংসা করেছে যাত্রীরা সবাই। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া সবাই একইসঙ্গে চেয়ার ছেড়েছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে খুশিতে। সবার চোখে ছিল আনন্দের অশ্রু।

তারপর ককপিট থেকে বেরিয়ে এলেন পাইলট ও কো-পাইলট। তাঁদের পিঠ চাপড়ে বেগুনী বানিয়ে দেয়া হলো। সবার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে ব্যথা হয়ে গেল তাঁদের হাত। মেইন ডোর খুলে ফেলল সিক্রেট ডিটেইল সাদাত হোসেন, মরুভূমি থেকে ধেয়ে এল তপ্ত হাওয়া। দূর করে দিল ভয়ের পরিবেশ।

আর ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো সাদাত হোসেনের মাথা! পিছনে ছিল স্টুয়ার্ডেস, ছিটকে তার চোখে-মুখে পড়ল তাজা রক্ত ও ছেঁড়া মগজ। রানওয়ের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে একদল লোক, প্রত্যেকে সশস্ত্র। বালি ও তারপুলিন দিয়ে ঢাকা ফক্স হোলে লুকিয়ে ছিল। পরনে খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় পেঁচানো কাফিয়ে। কেউ দরজা বন্ধ করবার আগেই মই নিয়ে এল ক'জন, আটকে দিল নীচের সিলে। পাইলট চট্ করে দরজা বন্ধ করতে চাইলেন, যেন নিজের দুর্গ রক্ষা করছেন বীর সেনাপতি। যে স্নাইপার সাদাত হোসেনকে খুন করেছে, সেই একই লোক গুলি করল পাইলটের কাঁধে। একহাতে জখমটা ধরে কাত হয়ে পড়ে গেলেন পাইলট। পরক্ষণে কেবিনে উঠে এল তিনজন লোক, হাতে একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল।

প্রধানমন্ত্রীর এইডদের ভিতর সালাম বিন আশরাফ বাঘের মত ধমকে উঠলেন। প্রধানমন্ত্রী ভয় পেলেন, ভদ্রলোককে মেরে ফেলা হবে এখুনি। উঠে দাঁড়ালেন সিট ছেড়ে।

এরপর বড় দ্রুত ঘটে গেল সব। সবাইকে খোলা দরজার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। আরও লোক উঠল বিমানে।

আরবিতে বারবার করে বলতে লাগল টেরোরিস্টরা, 'খবরদার, কেউ একচুল নড়বে না!'

প্রধানমন্ত্রী আরবিতে বললেন, 'আপনারা যা বলবেন আমরা তা মেনে নিচ্ছি। ভয় না দেখালেও চলবে।' বসে পড়লেন একটা চেয়ারে।

তাঁর দেখাদেখি সবাই চেয়ারে বসলেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল এক জঙ্গি, টেনে তুলল সিট থেকে। তাঁকে ঠেলে দেয়া হলো দরজার দিকে। এমনি সময়ে মই বেয়ে উঠল এক তরুণ। পরনে ইউনিফর্ম নেই। নীল প্যান্ট ও অক্সফোর্ড সাদা শার্টে তাকে কলেজের ছাত্র মনে হলো।

জীবনে ওই মুখ ভুলবেন না প্রধানমন্ত্রী। সে যেন কোনও দেবতা। দুধের মত ধবধবে ত্বক। ওয়্যায়ার ফ্রেমের চশমার ওপাশে দীর্ঘ পাপড়ি। ভাসা ভাসা মায়াবী চোখ। মনে হয় পড়ুয়া ধরনের। ছেলেটির বয়স বড়জোর বিশ। হালকা-পাতলা। তাকে এই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে একেবারেই মানাচ্ছে না। হাতে একটা বই ও তসবি। বইয়ের মলাটের অক্ষর থেকে বোঝা গেল, ওটা কোরান শরীফ।

লাজুক হাসল তরুণ, চলে গেল ককপিটের দিকে।

প্রধানমন্ত্রী ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে দেখলেন, তাঁর সঙ্গীদের হাত সিটের হাতলের সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রথম তিনি পরিষ্কার বুঝলেন, এরা কী করতে চাইছে। শিউরে উঠলেন। যে লোক তাঁর হাত ধরেছে, তাকে নরম স্বরে বললেন, 'দয়া করে এ কাজ করবেন না।'

জবাবে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে মইয়ের দিকে ঠেলল লোকটা। পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নিলেন তিনি। লোকটার কাফিয়ে সরে গেছে। লিবিয়ানদের মত সেমিটিক চেহারা নয়

তার। হতে পারে পাকিস্তানি বা আফগান। আবারও ধাক্কা দিল লোকটা, এবার আর সামলাতে পারলেন না তিনি। পড়লেন একটা সিটের পাশে। হাতলে ঠাস্ করে লাগল মাথা। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারালেন। কার্পেটে পড়লেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর ফিরল জ্ঞান। দেখলেন তাঁকে মইয়ের দিকে বয়ে নেয়া হচ্ছে। একবার আশরাফ সাহেবের চোখে চোখ পড়ল, দেখলেন ভদ্রলোকের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। উনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন কী ঘটতে চলেছে।

'আল্লাহ আপনার ভাল করুন,' ভারী গলায় বললেন।

'আপনাদেরও ভাল করুন,' জবাবে বললেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর তাঁকে নামিয়ে নেয়া হলো বিমান থেকে।

তাঁর পিঠে ধাক্কা দিয়ে এক শ' ফুট দূরে নিয়ে গেল লোকগুলো, জোর করে বসিয়ে দিল মাটিতে। হাত দুটো পিছমোড়া করে আটকে দিয়েছে হ্যাণ্ডকাফে। ককপিটের খুদে জানালা দিয়ে দেখলেন তরুণ ছেলেটা প্লেনের কন্ট্রোলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বিমানের লেজে গোল একটা গর্ত। বোধহয় কোনও মিসাইল আঘাত হানে ওখানে, তবে বিস্ফোরিত হয়নি। আন্দাজ করলেন তাঁকে বন্দি করবার জন্যই ওরা এই কাজ করেছে। সবাই ধারণা করবে তিনি মারা গেছেন।

তাঁর লোকদেরকে কেবিনের ভিতর আটকে রেখে বেরিয়ে এল সন্ত্রাসীরা। ককপিট থেকে বেরিয়ে দরজার উপর দাঁড়াল ছেলেটা, জড়িয়ে ধরল শেষ লোকটিকে। ওর কানে কী যেন বলে নেমে এল লোকটা, সরিয়ে নেয়া হলো মই। সবাই হৈ-হৈ করে উৎসাহ দিল তরুণ পাইলটকে। হ্যাচ বন্ধ করে দিল ছেলেটা, বোধহয় ফিরল ককপিটে।

প্রধানমন্ত্রীর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। জানালায় কয়েকজনকে দেখতে পেলেন। সবাই তাঁর লোক, বাংলাদেশের

মানুষ। এরা নিজ দেশকে ভালবাসে। বছরের পর বছর একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। মুখ সরিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। না, তিনি কাঁদবেন না।

কয়েক মুহূর্ত পর চালু হলো বিমানের ইঞ্জিন। গর্জন বাড়তে লাগল। যেন ফেটে যাবে কানের পর্দা। ধুলোময় রানওয়ে থেকে দূরে ছিল ক্যামোফ্লাজ করা একটা ইউটিলিটি ট্রাক্টর। ওটার উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো তারপুলিন। এ ধরনের ট্রাক্টর সব এয়ারপোর্টেই থাকে। বিশাল বিমানের নাকের সামনে এসে থামল ওটা, সামনের ল্যাণ্ডিং গিয়ারের সঙ্গে আটকে নেয়া হলো টো হুক।

কয়েক মিনিট ধরে বিমানের অবস্থান ঠিক করল ড্রাইভার। এয়ারবাস থামল রানওয়ের শুরুতে, সরে গেল ট্রাক্টর। বদলে গেল বিমানের ইঞ্জিনের গর্জন। রানওয়ের শুরু থেকে দৌড় দিল এয়ারবাস।

অন্তর থেকে প্রার্থনা করলেন প্রধানমন্ত্রী, বিমান যেন উড়তে না পারে। হয়তো মিসাইলের কারণে বড় ক্ষতি হয়েছে, টেকঅফ করবে না।

কিন্তু বিমানে রয়েছে অতি সামান্য তেল, যাত্রীও অনেক কম, হালকা ওজনের কারণে দ্রুত বাড়তে লাগল গতি। বিদ্যুদ্বেগে প্রধানমন্ত্রীকে পাশ কাটাল বিমান। এগযস্টের তপ্ত হাওয়া নিঃশ্বাসের মত এসে লাগল। টেরোরিস্টরা আকাশে গুলি ছুঁড়বার ফাঁকে চিৎকার করছে। বিমানের নাকের হুইল ধীরে ধীরে মাটি থেকে উপরের দিকে উঠল। দীর্ঘ এক মুহূর্ত আকাশে ঝুলে রইল, লেজের ক্ষতি এবং পাইলটের অদক্ষতার কারণে বিমানের শেষ অংশ বাড়ি খেল ধুলোময় রানওয়ের উপর।

এয়ারবাসের নাক নেমে আসতে লাগল মাটির দিকে। প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করতে চলেছেন। এদিকে ফুরিয়ে এল রানওয়ে। আর বোধহয় উঠবে না বিমান।

কিন্তু রাজকীয় ভঙ্গিতে আকাশে উঠে গেল এয়ারবাস। একটু কাত হয়ে উঠছে। জঙ্গিদের চিৎকার দ্বিগুণ হলো। শত শত গুলি ছুটল আকাশের দিকে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। দেখতে না দেখতে অনেক উপরে উঠে গেল বিমান। দ্রুত গতিতে চলেছে। চেয়ে রইলেন তিনি, জানেন না তাঁর সঙ্গীদের কোথায় নিয়ে চলেছে তরুণ। ওদিকে কোথাও রয়েছে ত্রিপোলি শহর। বলা যায় না, হয়তো শান্তি মহাসম্মেলনের হলঘরে আছড়ে পড়তে চলেছে। এখন পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করছে না সন্ত্রাসীরা। আকাশের দিকে চেয়ে আছে সবাই। বহু দূরে চলে গেছে এয়ারবাস। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু পারলেন না।

কাত হয়ে গেল এয়ারবাস, নাক তাক করল দূরের এক পাহাড়ের দিকে। নতুন করে উচ্চতা বজায় রাখতে চাইল পাইলট, আবার সোজা হলো বিমান। কিন্তু পরক্ষণে চিত হয়ে গেল, সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল টিলার উপর! ওই ভয়ঙ্কর পতনে থরথর করে কেঁপে উঠল এত দূরের জমিনও। বিভিন্ন টুকরো নানাদিকে ছিটকে গেল। ফিউজেলাজ থেকে ছিঁড়ে গেল ডানা, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো। ছিটকে বেরিয়ে গেল একটা ইঞ্জিন। চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে থামল টিলার চূড়ার কাছে। ওখান থেকে প্রচুর ধুলো উঠছে, হারিয়ে গেল দৃশ্যটা। অনেকক্ষণ পর সরে গেল ধূলিকণা। এবার দেখা গেল দাউ-দাউ করে জ্বলছে দুই ডানা। তবে আগুনের আওতা থেকে গড়িয়ে সরে গেছে ফিউজেলাজের সাদা একটা অংশ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। চারপাশে উল্লসিত চিৎকার, ওই তরুণ পাইলটের প্রশংসা করছে সবাই। চূড়ান্ত ফ্যানটিসিজম বোধহয় একেই বলে। বাংলাদেশে তিনি কঠোর হাতে দমন করেছেন এদের, আজকের ঘটনা কি তারই

প্রতিক্রিয়া?

এত দূর থেকে দেখেও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সঙ্গের মানুষগুলো আগুনে পুড়ে মরেনি, তবে ওই ক্র্যাশের পর কারও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। একটু দূরে নিচু কণ্ঠ শুনতে পেলেন। ক'জন আপত্তির সুরে বলছে বিমান আরও বেশি পোড়া উচিত ছিল। আলাপ শুরু হলো এরপর কী করবে।

তিনি যেখানে বসেছেন তার খানিক দূরে কী যেন। তারপুলিন সরে যেতে দেখা গেল ওটা মাটি সরানোর মেশিন। এক লোক গিয়ে উঠল ক্যাবে, চালু হলো ইঞ্জিন। মেশিনটা চলে গেল রানওয়ের গোড়ায়, কাজ শুরু করল। এই এয়ারফিল্ড দিয়ে এয়ারবাসকে আকর্ষণ করা হয়েছে। যে গতিতে কাজ চলছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার ভিতর হারিয়ে যাবে রানওয়ে ও চারপাশের সব চিহ্ন।

হঠাৎ লোকগুলোর আলাপে ছেদ পড়ল। প্রধানমন্ত্রী যাকে নেতা মনে করেছেন, সে একের পর এক নির্দেশ দিল। বেশিরভাগ শুনতে পেলেন না তিনি, তবে এটা কানে এল: 'এখান থেকে মুছে ফেলো প্লেনের ছাপ। পাহাড়ে গিয়ে খেয়াল রাখবে মিসাইলের চিহ্ন যেন না থাকে। আর লাশগুলো থেকে খুলে আনবে হ্যাণ্ডকাফ।' এরপর প্রধানমন্ত্রীর দিকে এল সে।

'কেন এ কাজ করলেন?' আরবিতে জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

ঝুঁকে এল লোকটা, কাফিয়ের ভিতর থেকে দেখা গেল সরু দুটো চোখ। তাতে ভয়ঙ্কর উন্মাদনা। 'কারণ, আল্লাহ্ এটাই চেয়েছেন।' নিজের এক লোককে ডাকল সে। 'একে নিয়ে যাও। ইউনুস আল-কবির তাঁর প্রাইজ দেখতে চাইবেন।'

মাথা ঢেকে দেয়া হলো কালো কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে, আর কিছুই দেখতে পেলেন না। ধরাধরি করে তুলে দেয়া হলো ট্রাকের

পিছনে। আবার যখন থলে সরিয়ে নেয়া হলো, দেখলেন তিনি আছেন এই সেলে। তাঁকে আগেই পরিয়ে দেয়া হয়েছে বোরখা। জিনিসটা আফগানি ছাদ্রি। দুই চোখ ছাড়া সব ঢাকা পড়েছে। চোখের সামনে ঝুলছে নাইলনের নেট।

তারপর থেকে শুধু অপেক্ষা। কার জন্য, কীসের জন্য, তিনি জানেন না। এরা বোধহয় মেরে ফেলবে তাঁকে। তার আগে মানসিক কষ্ট দিতে চাইছে। বড় ধীরে পেরুচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ দূরে দরজা খোলার আওয়াজ শুনলেন। ধম করে বাড়ি খেল দরজা। বোধহয় খাবার আসছে। দূর থেকে এল পায়ের শব্দ। খটাং শব্দে খুলল বোল্ট, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল। এখন পর্যন্ত সেই তরুণ পাইলট এবং যে-লোক বিমানে তাঁকে ধাক্কা দেয়, তারা ছাড়া আর কাউকে খেয়াল করেননি। এবার দেখলেন দু'জন লোক ভিতরে ঢুকেছে। পরনে খাকি ইউনিফর্ম। তবে কোনও ইনসিগনিয়া নেই। মাথা পেঁচিয়ে রেখেছে কাফিয়ে দিয়ে।

উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী।

বামদিকের লোকটা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত দাঁত খিঁচাল। তাদের বন্দির হাতে হ্যাণ্ডকাফ, তবে ছিঁড়ে ফেলেছেন ছাদ্রি। ওটা ব্যবহার করেছেন বালিশ হিসেবে। দ্বিতীয়বার তাঁর মুখের দিকে চাইল না লোকটা, বোরখা তুলে মাথা দিয়ে গলিয়ে দিল। 'তুমি এখন থেকে পুরুষকে সম্মান দেখাবে! চলো, তোমাকে নিতে এসেছি।'

'কোথায় যেতে হবে?' জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

মুঠো করে হাত উঁচু করল লোকটা। 'কোনও প্রশ্ন নয়। আর একটা কথা বললে দাঁত ভেঙে দেব।'

প্রধানমন্ত্রীকে দু'পাশ থেকে ধরে সেল থেকে বেরুল ওরা, করিডোর ধরে এগিয়ে পেরুল চারটে ঘর, তারপর বেরিয়ে গেল দালান থেকে। জীবনে প্রথমবার বোরখার কারণে খুশি হলেন

তিনি। সামনে নেটের কাপড় না থাকলে ঝলসে যেত দুই চোখ। জ্বলজ্বলে সূর্য পোড়াচ্ছে মরুভূমিকে। সোনালী গোলকের অবস্থান থেকে আন্দাজ করলেন, এখন মাঝ-সকাল। গরম আরও বাড়বার কথা, তবে তাঁরা রয়েছেন পাহাড়ের অনেক উপরে।

ছবিতে এ ধরনের টেরোরিস্ট ক্যাম্প দেখেছেন তিনি। একটা টিলার গোড়ায় কয়েকটা পুরনো তাঁবু। টিলার খানিক উপরে অসংখ্য গুহা। যদি এই ক্যাম্পে হামলা হয়, এই লোকগুলো আশ্রয় নেবে ওখানে। সন্দেহ নেই, গুহার ভিতর রয়েছে প্রচুর গোলাবারুদ, বিস্ফোরক। প্রয়োজনে অর্ধেক পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

বামে প্যারেড গ্রাউণ্ড। একদল লোককে ক্যালিসথেনিকস করাচ্ছে ড্রিল ইন্সট্রাকটার। লোকগুলোর নড়াচড়া থেকে বোঝা যায়, শেষ হয়ে এসেছে ট্রেইনিং। বিশাল টিলা ঝুঁকে এসেছে ক্যাম্পের দিকে। ওখানে একদল লোক টার্গেট টাঙিয়ে গুলি ছুঁড়ছে একে-৪৭ দিয়ে। জায়গাটা এত দূরে যে প্রধানমন্ত্রী বুঝলেন না ঠিক ভাবে টার্গেটে গুলি লাগছে কি না। তবে বড় কথা: এই টেরোরিস্ট দলের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এখানে নতুন রিক্রুটও ব্যবহার করে তাজা কার্তুজ।

শুটিং রেঞ্জ থেকে আধ মাইল দূরে উঁচু উপত্যকা। ওটাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে বিশাল উঁচু পাহাড়। বোধহয় উপত্যকার নীচের অংশ খনি, সেখানে খনন চলছে। একপাশ দিয়ে গেছে রেললাইন। একটা সাইডিঙে বেশ কয়েকটা বক্স-কার। পাশে কাঠের জীর্ণ দালান। খানিক দূরে প্রকাণ্ড ডিজেল লোকোমোটিভ, চারদিকের ছোট ইঞ্জিনগুলোকে বামন করে দিয়েছে। যে ট্রাক তাঁকে এখানে এনেছে, সেটার সমান হবে ছোট ইঞ্জিনগুলো। বোরখার নেটিঙের ফলে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখা হলো না।

প্রকাণ্ড এক গুহার পাশে ছোট আরেকটা গুহা। তাঁকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল দুই জঙ্গি। ছাতে ইলেকট্রিক তার। প্রতি তিরিশ ফুট

পর পর জ্বলছে একটা করে বালব। বাইরের তুলনায় গুহার ভিতর অংশ কিছুটা শীতল। তবে চারপাশ এত বদ্ধ, আঁকড়ে আসতে চায় বুক। পুরনো বাড়িতে বাসি একটা গন্ধ থাকে, এখানেও ঠিক তেমন। কিছুদূর যাওয়ার পর থামতে হলো। সামনে পুরু দেয়াল আটকে দিয়েছে পথ। দেয়ালে বড়সড় দরজা, কাঠের। হাত বাড়িয়ে দরজায় টোকা দিল একজন, দরজা খোলার চেষ্টা না করে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত। ভিতর থেকে আদেশ পেলে নড়বে, তার আগে নয়।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর ডাক এল।

দরজা খুলে প্রধানমন্ত্রীকে ভিতরে ঠেলে দিল প্রহরী। পিছনে দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রইল দুজন। বোধহয় গুহার শেষ অংশ এদিক। তিনদিকে রুক্ষ পাথুরে দেয়াল। মেঝের উপর পাঁচ ইঞ্চি পুরু পারশিয়ান কার্পেট। চতুর্থ কোণে জ্বলছে কয়লার আগুন। বিদ্যুৎবাহী তারের পাশে স্টিলের চিমনি, ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় ধোঁয়া।

ঘরের মাঝে নামাজের ভঙ্গিতে বসে আছে এক লোক। পরনে ধবধবে সাদা আলখেল্লা। মাথার উপর কালো-সাদা কাফিয়ে। বাতির মৃদু আলোয় কিছু পড়ছে। ওটা কোরান শরীফ। মুখ তুলে চাইল না। যেন জানেই না কেউ এসেছে।

দেখবার মত দৃশ্য। ঋষিদের মত খাড়া হয়ে বসে কিতাব পড়ছে সে। আধ মিনিট পেরুল, মুখ তুলল না। বিরক্ত হলেন প্রধানমন্ত্রী। লোকটা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

আরও দু' মিনিট পেরুনোর পর কোরান বন্ধ করল সে, যত্ন করে সরিয়ে রাখল। শান্ত স্বরে জানতে চাইল, 'আপনি কি জানেন আমি কে?'

'আলী বাবার চল্লিশ চোরের একজন,' বিরক্ত হয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী।

'সঠিক বলেননি আপনি।'

'তা হলে আপনি কে?'

মনে মনে বললেন প্রধানমন্ত্রী: তুমি নৃশংস খুনি দানব, আর কেউ নও। লোকটা কিছুই বলছে না। তিনি আবার বললেন, 'কেউ জানে না তুমি কে। বোধহয় নিজের নাম নিজেই দিয়েছ ইউনুস আল-কবির। ঘোষণা দিয়েছ ইজরায়েল ও পশ্চিমা বিশ্বকে ধ্বংস করবে। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মরোক্কো পর্যন্ত এক বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র গড়বে। ...আর সন্দেহ নেই, ওই দেশের সুলতান হতে চাও তুমি।'

'আমি এখনও ঠিক করিনি কোন খেতাব নেব,' বলল নব্য আল-কবির। 'সুলতান হওয়া ঠিক আছে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয় খেতাব। তা ছাড়া, আমি কাউকে নকল করা ভালবাসি না। হারেম, প্রাসাদ ইত্যাদি আমার জন্য নয়।'

অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে, যেন নড়ছে সাদা বাদুড়। পাশে রাখা টেবিল থেকে পিতলের কেতলি তুলল, গ্লাসে ঢেলে নিল চা। চিতার মত মসৃণ হাঁটা-চলা।

লোকটা অন্তত ছ' ফুট, আন্দাজ করলেন প্রধানমন্ত্রী। চওড়া কাঁধ। কব্জি বলছে শক্তপোক্ত দেহ। মৃদু আলোয় দেখা গেল না কাফিয়ে ঢাকা চেহারা। বোরখার নেট সরালে একটু ভাল দেখা যেত।

'না, বিলাসিতা আমার জন্য নয়। আমি এসেছি মানুষকে ঠিক পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য। আর আপনাদের মত একদল ভ্রষ্ট মানুষ আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। আপনি তাদের অন্যতম। আপনি কি মনে করেন আপনাকে মাফ করবেন আল্লাহ?'

'কাকে তিনি মাফ করবেন, আর করবেন না, তা তাঁর ইচ্ছে,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'তবে যারা শান্তি চায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াশীল হন। যারা বিনা কারণে মানুষ হত্যা করে,

তাদের প্রতি তাঁর রয়েছে প্রবল ঘৃণা।'

'ভাল বলেছেন। কিন্তু কেন? কেন শান্তি চাইছেন? কেন চাইছেন সম্মেলন?'

'তা জেনে কী করবেন?' চুপ থাকতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু টের পেলেন তর্কের ভিতর জড়িয়ে পড়েছেন। বুঝছেন এই কালের ইউনুস আল-কবিরও শিক্ষিত লোক। তাঁর জানতে ইচ্ছে হলো গণহত্যাকে কীভাবে জায়েজ করবে এ লোক। যত বর্বর জঙ্গি আজ পর্যন্ত নিরীহ মানুষ হত্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই ছিল নানা ধরনের যুক্তি। আসলে ভেবে নেয়া সোজা: আল্লাহ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানব হত্যা করলে কিছুই হবে না, বরং পাবে বেহেস্ত।

'আপনি ইসলামের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন,' বলল আল-কবীর। 'হাতে রেখেছেন পশ্চিমা বিশ্বকে। ...ভেবেছেন পার পেয়ে যাবেন? বড় গলা করে বলছেন পৃথিবীতে শান্তি আসুক। কিন্তু বাংলাদেশের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, শুনে রাখুন, শান্তি আসবার অর্থ উন্নতি থেমে যাওয়া। মানুষ যখন শান্তিতে থাকে, তার মন থেকে উধাও হয় সৃষ্টিশীলতা। আল্লাহ বিবাদ সৃষ্টির জন্য তৈরি করেছেন মানুষকে। প্রাণপণ যুদ্ধে প্রকাশ পায় কার বুকে কত সাহস, আমরা আত্মবিসর্জন করি। শান্তি আমাদের কী দেবে? কিছুই না।'

'তুমি ভুল বললে। শান্তি এনে দেয় সুখ, সমৃদ্ধি।'

'এগুলো তো শারীরিক আনন্দ। আত্মা কী পাবে? আপনাদের মত মানুষ ভাল কোনও টেলিভিশন সেট বা সুন্দর গাড়ি পেলে মনে করেন সুখী হয়েছেন। কিন্তু সুখ এত সহজ বিষয় নয়।'

'তোমাদের তৈরি যুদ্ধ আনে কষ্ট ও অসহায়তা,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মনে পড়ল আফগানিস্তানের পরিণতি। আর ঠিক এর মত একদল লোক বাংলাদেশে বোমা ফাটিয়ে, মানুষ হত্যা করে দখল করতে চায় ক্ষমতা।

'ঠিকই বলেছেন, যুদ্ধ কষ্ট ও অসহায়তা এনে দেয়। কিন্তু যুদ্ধ করলে আত্মা পবিত্র হয়, দেহের নোংরামি থেকে দূরে থাকা যায়। আমরা চাই স্বর্গীয় অনুভূতির পরশ। আমরা বড় কোনও বাড়ি চাই না, একসঙ্গে লড়াই করে পাশাপাশি টিকতে চাই। এই কষ্ট আমাদেরকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর খুব কাছে। বলুন, আপনাদের গণতন্ত্র কী দেবে? আমরা খুঁজি মানবের সত্যিকারের অস্তিত্ব। পৃথিবীতে এসে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর কাছে আত্মবিসর্জন দেয়া।'

'আল্লাহ তোমাদের বলে দিয়েছেন এসব খুন-খারাবি করতে হবে?' তিক্ত হাসলেন প্রধানমন্ত্রী। 'তোমরা কী করে ধরে নিলে তিনি কী চান? কোরানে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, কেউ যেন আত্মহত্যা না করে। অথচ তোমার মত ক্ষমতালোভী একদল মানুষ বিপথে নিয়ে গেছ তরুণ-তরুণীদের। যেমন তুমি, ওই বাচ্চা ছেলেটাকে দিয়ে ক্র্যাশ করিয়েছ বিমান।'

'সে শহীদ হয়েছে।'

'আল্লাহ তাকে শহীদ হতে বলেননি,' তীক্ষ্ণ শোনাল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠ। 'কিন্তু তুমি তাকে বুঝিয়েছ মরলেই সে শহীদ হবে। আর তা হলেই মিলবে বেহেস্ত। খুশিতে থাকবে অসংখ্য হুর পরীকে নিয়ে। আল্লাহ ছাড়া কে বলতে পারে একজন মানুষ বেহেস্তে যাবে, না দোজখে? আমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখি। আমার মত বহু মানুষ বিশ্বাস রাখেন তাঁর উপর। কিন্তু অন্তর থেকে বলতে পারি, তুমি নিজে তাঁকে বিশ্বাস করো না। আমার ধারণা, তুমি সস্তা এক প্রতারক। খারাপ বুদ্ধি দিয়ে অন্যদের ভুল পথে নিয়ে যাও। তোমার মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা অর্জন করা।'

দু'বার হাত তালি দিল আল-কবির, হাসছে। প্রথমবারের মত ইংরেজিতে বলল, 'ভাল, ভাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী।'

চুপ রইলেন প্রধানমন্ত্রী।

'একটা বিষয় ঠিকই বলেছেন, দুনিয়ার মস্ত মঞ্চে ক্ষমতা অর্জনই সবসময় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। দুই শ' বছর আগে শক্তিশালী নেভি দিয়ে দুনিয়া দখল করে নেয় ইংল্যাণ্ড। আর এখন বিত্ত ও নিউক্লিয়ার আর্সেনালের কারণে দুনিয়া শাসন ও শোষণ করছে আমেরিকা। আর ওই দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করছে আপনাদের মত পাতি নেতা-নেত্রীরা। সে-লোক যা বলছে, মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যের কিছু মানুষ তা মানতে রাজি নয়। তারা পা চাটার বদলে বোমা দিয়ে নিজেদেরকে উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, খুব নৃশংস অস্ত্র। কিন্তু তাতে কী? নিশ্চিত থাকুন আমরা আবারও ইসলাম কায়েম করব। তখন মাথার উপর আর ছড়ি ঘোরাবে না খ্রিস্টানরা।

'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার আগে শহীদ হওয়ার জন্য তৈরি ছিল পাঁচ লাখ মুসলিম ভাই-বোন। এখন সংখ্যাটা হয়েছে তার দ্বিগুণ। শুধু আপনাদের দেশে দশ হাজার ছেলে-মেয়ে তৈরি আছে শহীদ হওয়ার জন্য—আপনারা তাদের বলেন সন্ত্রাসী। তারা যখন একের পর এক বোমা ফাটাবে, আপনাদের ক্ষমতা বাতাসে মিলিয়ে যাবে। আমরা জানি এই জিহাদীরা সামান্য ঘুঁটি ছাড়া কিছুই নয়। ওদের বোর্ডে বসিয়ে খেলছি আমরা। ওরা মারা গেলে আরও আসবে। লোকবলের অভাব নেই আমাদের। বিশেষ করে আপনাদের দেশে। দু'মুঠো খাবারের জন্য, চাকরি পাওয়ার জন্য, ওরা সব করতে পারে। আমরা যখন সত্যিই ওদেরকে যুদ্ধে নামাব, এশিয়ার কোনও সরকার টিকবে না। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারবে না কেউ। তখন আমি নতুন করে পৃথিবীর সীমানা নির্ধারণ করব।'

লোকটাকে উন্মাদ মনে হলো না প্রধানমন্ত্রীর। এ যেন শক্তিশালী কোনও করপোরেট প্রেসিডেন্ট। ধীরে ধীরে বলছে অদূর ভবিষ্যতে কী করবে।

'কারও সাধ্য নেই আমাদেরকে ঠেকায়। ভবিষ্যতে শান্তির নামে পশ্চিমাদের পা চাটা চলবে না।' থুতনির নীচ থেকে কাফিয়ে সরিয়ে দিল ইউনুস আল-কবির। চমকে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী, মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। 'আর ওই সম্মেলনের শুরুতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন আপনি!'

পনেরো

পাহাড় পেরিয়ে চলে গেল কপ্টার। আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ড্রাই ওয়াশ থেকে বেরিয়ে এল নিশাত, নবী ও স্বর্ণা, রওনা হয়ে গেল সরু ফাটলের দিকে।

বিশ মিনিট লাগল পাথুরে ফাটলে পৌঁছতে। ট্রাকের স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসল নিশাত, চালু করল ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে বের করে আনল ট্রাক।

ট্রাকের ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড কমিউনিকেশন সিস্টেমে বলে উঠল নবী, 'সোহেল কাবাব-ঘর?'

অফরোড ট্রাকের ভিতর স্পিকারের মৃদু আওয়াজ। এ গাড়ি এতই যত্নে বানানো, ইঞ্জিনের আওয়াজ ভিতরে ঢুকছে না বললেই চলে। সুন্দরীর ভোঁতা নাক তিউনিশিয়া সীমান্তের দিকে তাক করল নিশাত।

চেনা যায় না এমন এক কণ্ঠ জবাব দিল, 'সোহেল কাবাব-ঘর। কিছু পিকআপ করতে হবে, না ডেলিভারি দিতে হবে?'

'ডেলিভারি না পিকআপ জানি না, আমি চার প্লেট খাসির

কারাব চাই,' বলল নবী।

'দুঃখিত, আপনি রং নম্বরে ফোন করেছেন।'

লাইন কেটে দিল নবী। আবারও ডায়াল করল, তবে ফোন এখন সিকিউর লাইনে।

সোহেলের কণ্ঠ ভেসে এল: 'হ্যালো, নবী।'

'সোহেল ভাই, আমার সঙ্গে নিশাত আপা আর স্বর্ণা।'

'রানা কোথায়?'

সংক্ষেপে বলল নবী। তারপর জানাল, 'মাসুদ ভাই চান তাঁর বায়ো ট্র্যাকিং চিপস ফলো করা হোক। আপনি অপারেশন্স সেন্টারে, সোহেল ভাই?'

'হ্যাঁ। এক মিনিট।' নীরবতা নেমে এল।

এ সুযোগে সুন্দরীর কমপিউটারে জ্যাক লাগাল নবী। এবার মার্ভেলের ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন সিস্টেম থেকে ইমেজ এল। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে অপারেশন্স সেন্টার। কমিউনিকেশন স্টেশনে ডিউটি অফিসারের কাঁধের পিছনে দাঁড়িয়েছে সোহেল। নিচু স্বরে বলল, 'ইন্টারেস্টিং। তোমরা তিনজন চলেছ পশ্চিমে। এদিকে রানা চলেছে উত্তর-পুবে। গতিবেগ এক শ' মাইল। ব্যাপার কী, তোমাদের ভিতর ঝগড়া হয়েছে?'

'একরকম তাই,' জবাব দিল নিশাত। 'কারও কথা শুনলেন না মাসুদ ভাই, কপ্টারে উঠে চলে গেলেন।'

এবার বলল নবী, 'যারা প্রধানমন্ত্রীর বিমান ভূ-পাতিত করেছে, তাদের সঙ্গে চলেছেন। তাঁর ধারণা, প্রধানমন্ত্রী মারা যাননি। এদিকে আমরা চলেছি তিউনিশিয়া সীমান্তের দিকে।'

'তোমাদের ধারণা ওই বিমান ভূ-পাতিত করা হয়?'

'জী। বিমান যখন ধ্বংস করে দেয়া হয়, ভিতরে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না।'

'তা কী করে সম্ভব? সংক্ষেপে খুলে বলো। বিশ মিনিট আগে

লিবিয়ানরা ঘোষণা দিয়েছে: ওই বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। লিবিয়ান সরকার জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার চাইলে নিজেদের এভিয়েশন এক্সপার্টদের পাঠাতে পারে তদন্ত করতে। এ দল আছে এখন কায়রো এয়ারপোর্টে। বিকেলের আগে পৌঁছবে। কিন্তু তার আগেই ওই এলাকায় পৌঁছবে লিবিয়ান অফিসাররা।'

'কিন্তু ওখানে কিছুই পাবে না,' বলল নবী। 'একদল লোক কপ্টারে করে এসে ধ্বংসাবশেষ বিকৃত করেছে। ভাঙা টুকরোগুলো এদিক ওদিক সরিয়েছে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে। কপ্টারে করে সরিয়ে নিয়েছে অনেক কিছু। কীভাবে বিমান ক্র্যাশ করে তা আর জানার উপায় নেই। এদের সঙ্গে ছিল খোঁড়া এক উট, ওটা দিয়ে চারপাশে ছাপ ফেলেছে।'

'খোঁড়া উট?'

'যাতে মনে হয় ওখানে গিয়ে মূল্যবান সবকিছু সরিয়ে নিয়েছে যাযাবররা।'

'তা হলে আমাদের কয়েক পা আগে হাঁটছে কেউ,' বলল সোহেল।

'মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে যে বাংলাদেশি এভিয়েশন টিম আসছে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'না। বিসিআই চিফ জানিয়েছেন, এ-তথ্য জানে শুধু উপর পর্যায়ের লিবিয়ান অফিসাররা। কিছুই ফাঁস করা হয়নি।'

'তার মানে শত্রুপক্ষ নিজের লোক রেখেছে সরকারের ভিতর,' বলল স্বর্ণা। 'এজন্যেই ওরা আবার ফিরে এসে ধ্বংসাবশেষ ঘাঁটাঘাটি করেছে।'

'এ-ও হতে পারে লিবিয়ান সরকারই এসব করছে,' বলল সোহেল। 'তোমাদের কি ধারণা বিমানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না?'

'আমরা যা প্রমাণ পেয়েছি, তাতে মনে হয় ওই বিমানকে

আগেই মরুভূমিতে নামানো হয়। এরপর আবার ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলা হয় পাহাড়ের উপর।'

'তার আগেই প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়?'

'তাই তো মনে হয়। যারা একাজ করেছে, তারা চাইছে মানুষ মনে করুক তিনি মারা গেছেন।'

'সবাই তাই ধারণা করলে কী ফায়দা পাবে ওরা?' জানতে চাইল সোহেল।

'জানি না, সোহেল ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'তবে তিনি শান্তি মহাসম্মেলনের বিষয়ে খুব তৎপর ছিলেন। বারবার বলেছেন এই মহাসম্মেলন শতাব্দির সেরা সুযোগ। তিনি প্রধান বক্তাদের ভিতর অন্যতম ছিলেন। হয়তো তাঁকে সরিয়ে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে টেরোরিস্টরা। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলে অনেকেরই উৎসাহ দমে যাবে।'

নীরবতা নেমে এল। স্বর্ণার বক্তব্য নিয়ে ভাবছে ওরা। টেরোরিস্টরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে হাতে পেলে বিশ্ব নেতাদের উপর একহাত নিতে পারবে। এদিকে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে জঙ্গিবাদ। আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মত শুরু হবে বোমা হামলা। কে ঠেকাবে তখন জঙ্গি সন্ত্রাসীদের?

'প্রধানমন্ত্রী বেঁচে থাকলে তাঁকে যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে,' নীরবতা ভাঙল সোহেল।

'আমাদের দেবার মত নতুন কোনও তথ্য আছে, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'হ্যাঁ, আছে। বিসিআই চিফ জানিয়েছেন তিউনিশিয়ায় বাংলাদেশি আর্কিওলজিকাল টিম কাজ করছে। জায়গাটা লিবিয়ান বর্ডারের পাশে। এদের সঙ্গে রয়েছে বিসিআই-এর এজেন্ট সবুর রহমান। ওই মিশনকে মিডিয়াম প্রায়োরিটি দেয়া হয়। ধারণা করা হয় তারা সফল না-ও হতে পারে।'

'ওরা ওখানে কী করছে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

বুঝিয়ে বলল সোহেল।

কয়েক মাস আগে আহমেদ শরীফ নামের এক বাংলাদেশি গুরুত্বপুর্ণ কিছু চিঠি হাতে পান। তার ভিতর ছিল ঐতিহাসিক জলদস্যু ইউনুস আল-কবিরের বিষয়। বিখ্যাত এই দস্যু এক নদীর তীরে অবস্থিত গোপন গুহায় বসে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। পরে শুকিয়ে যায় নদীটা, হারিয়ে যায় সেই গুহা। বাংলাদেশি আর্কিওলজিকাল টিম চাইছে ওই প্রবন্ধগুলো উদ্ধার করতে। প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন ওগুলো মহাসম্মেলনে পাঠ করবেন। এসব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় কীভাবে পাশাপাশি টিকে থাকতে পারে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম। মূল কথা: একে অপরের উপর হামলা না করে, সবাই মিলে শান্তিতে বাস করা সম্ভব।

'এসব প্রবন্ধ পেলে ভাল, কিন্তু আগে তো পেতে হবে ওই গুহা,' বলল স্বর্ণা। 'এসবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আছে প্লেন ক্র্যাশের?'

'কো-ইনসিডেন্টাল হতে পারে, একই এলাকায় দুটো ঘটনা ঘটেছে। জানি না দুটোর ভিতর কোনও সংযোগ আছে কি না। প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়ে ওই এক্সপিডিশনের অনুমোদন দেন। আর্কিওলজিস্টদের ফাণ্ড দেয়া হয় সরকার থেকে। আশা করা হয় ওই ধর্মীয় নেতার লেখাগুলো মিলবে। এ ধরনের লেখার মূল্য অনেক। কোটি কোটি লোক এসব মানবে। যেমন মেনে নিয়েছে আয়াতোল্লাহ খোমেনির ফতোয়া। তিনি ঘোষণা করেন আত্মঘাতী হামলা জায়েজ। কিন্তু কোরানে...'

'পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয় আত্মহত্যা চলবে না,' কথা শেষ করল স্বর্ণা।

'যা হোক, চার আর্কিওলজিস্টকে পাঠানো হয় তিউনিশিয়ায়,' বলল সোহেল। 'কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে তাদের তিনজন।

স্থানীয় সরকার থেকে এক লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সে আর্কিওলজিস্টদের অনুমতি দেয়, বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতর একবার করে ক্যাম্পে ফিরলেই চলবে। কিন্তু সেই সময় পেরিয়ে গেছে।'

'এ ঘটনা এবং প্রধানমন্ত্রী হারিয়ে যাওয়ার ভিতর কোনও সংযোগ থাকতে পারে?' সন্দেহ নিয়ে বলল নবী।

'থাকতে পারে, বিসিআই চিফ তাই ধারণা করছেন,' বলল সোহেল। 'তিনি চান তোমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখবে।'

'তদন্ত করব?' একটু থমকে গিয়ে বলল স্বর্ণা। 'কিন্তু... মাসুদ ভাই গেছেন টেরোরিস্টদের সঙ্গে। তারা সন্ত্রাসী না লিবিয়ার স্পেশাল ফোর্স, আমরা জানি না। এরা যে প্লেন ক্র্যাশের সঙ্গে জড়িত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় যখন তখন আমাদেরকে লাগতে পারে মাসুদ ভাইয়ের। আর...'

'অথচ মরুভূমি পেরিয়ে ছুটতে হচ্ছে আর্কিওলজিস্টদের পিছনে?' বলল সোহেল। 'এখন তোমাদের কাজ...'

কী ভেবে যেন বাধা দিল নবী। 'এক সেকেণ্ড, সোহেল ভাই। ... রায়হান কোথায়, বলবেন?'

'নিজের কেবিনে। অফ ডিউটি।'

'ওই কেবিনে একটু লাইন দেবেন? খুব জরুরি।'

আধ মিনিট পেরুল, তারপর লাইনে এল রায়হান। 'কী বিষয়, কচি বালক?'

'রায়হান, আমরা যখন স্যাটালাইট ইমেজ দেখি, মনে পড়ে পরিত্যক্ত একটা ট্রাক দেখতে পাই মরুভূমিতে? ওটা আমাদের তৈরি ফ্লাইট পাথ থেকে বেশি দূরে ছিল না?'

'মনে আছে।'

'ওটার ক্লোজ-আপ ছবি আর জিপিএস কোঅর্ডিনেটস পাঠা।'

ওয়েবক্যামের সামনে থেকে সরে গেল রায়হান। কি-বোর্ডে টাইপ করছে। 'পাওয়া গেছে,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল। 'ই-মেইল

করে দিলাম জিপিএস নম্বর। এবার পাঠাব ট্রাকের জুম করা ছবি। ট্র্যাকিং তথ্য দেখছি। তোরা ওখান থেকে মাত্র এক শ' চার মাইল দূরে। বড়জোর আড়াই ঘণ্টা লাগবে পৌঁছতে।'

'অত সোজা নয়, আমরা কি কাক যে সোজা উড়ে যাব?' বলল নবী। 'এঁকেবেঁকে যেতে হবে। ছবিটা মেইন স্ক্রিনে তুলে সোহেল ভাইকে ফোন দে।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর এল সোহেলের কণ্ঠ। 'এটাই ওই ট্রাক?'

'জী।'

'বস্ জানিয়েছেন ট্রাকের সঙ্গে ড্রিল রিগ থাকবে। এটা দেখে তো সেরকমই লাগছে। এত তাড়াতাড়ি ছবি পেলে কোথা থেকে?'

'আগেই রায়হানের কমপিউটারে ছিল।' ব্যাখ্যা দিল না নবী। ওটা থাকল রায়হানের জন্য।

'তা হলে খানিক অন্যদিকে যেতে হবে তোমাদেরকে,' বলল সোহেল। 'ওই ট্রাক তল্লাসী করবে। আরেকটা কথা, ইন্টারভিউ নেবে আর্কিওলজিস্টদের চতুর্থ সদস্যের। লোকটার নাম ব্রাম ট্যাগার্ট। সে আছে রোমান খনন এলাকায়। সে এরইমধ্যে এক প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে। তবে বিসিআই চিফ বলেছেন লোকটা কোনও কাজে গা নড়াতে চায় না। তবে মুখোমুখি কথা বললে নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।'

'কিন্তু মাসুদ ভাইয়ের কী হবে?' আগের প্রসঙ্গে ফিরল স্বর্ণা। 'আমার মন বলছে তাঁকে পরিত্যাগ করছি আমরা।'

'রানার জন্য ভেবো না,' বলল সোহেল। 'ওর যা কপাল, ওই কণ্টার উড়িয়ে নিয়ে নামবে সাত-তারা হোটেলে। সঙ্গে সঙ্গে পাবে রাজকীয় ডিনার।' আর কিছু বলল না, তবে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে সোহেল।

আট ঘণ্টার বেশি মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে সুন্দরী। আরও খানিক

সামনে সেই ড্রিল ট্রাক। জমি এখানে উঁচু-নিচু। মাঝে মাঝে টিলা। কোথাও কোথাও শুকিয়ে যাওয়া ঝর্নার খাত। নবী ও স্বর্ণার ধারণা হয়েছে হাজার ঝাঁকি খেয়ে মোরব্বা হয়ে গেছে শরীর, থলথল করছে মাংস, চুরচুর হয়ে গেছে হাড়। এবার ত্বক ফেটে গেলেই হালুয়া হয়ে যাবে ওরা।

ওরা দু'জন বারকয়েক জায়গা বদল করেছে। এখন নিশাতের পাশে শটগান হাতে স্বর্ণা। গম্ভীর চেহারায় ট্রাক নিয়ে চলেছে নিশাত, যেন কখনও ক্লান্ত হবে না। পশ্চিম দিগন্তে ডুবছে সূর্য। রায়হানের দেয়া জিপিএস কো-অর্ডিনেটস দেখে চলেছে তিনজনের দলটি। কোনও সমস্যা না করেই চলছে সুন্দরী। এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ ফিউয়েল রয়েছে, অনায়াসে তিউনিশিয়া সীমান্ত পেরুতে পারবে। একবার ওখানে পৌঁছলে ডিজেল জোগাড় করতে হবে। নবীর ধারণা আর্কিওলজিকাল সাইটে টাকার বিনিময়ে সবই মিলবে। তা যদি না হয়, মার্ভেল থেকে ম্যাকডোনেল ডগলাস এমডি-৫২০এন কপ্টার নিয়ে রওনা হবেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, পৌঁছে দেবেন ব্ল্যাডার ভরা ডিজেল। ওই কপ্টার সহজে এক টন ওজন নিতে সক্ষম।

আবারও সামনে পড়েছে ধূ-ধূ মরুভূমি। বহুদূরে দেখা যায় টিলাসারি। হঠাৎ বামে কী যেন চোখে পড়ল। জিনিসটা সিকি মাইল দূরে। আবছা আলোয় ভাল দেখা গেল না। আরও কিছু দূর যাওয়ার পর আঙুল তুলে ওদিক দেখাল নিশাত। মাত্র এক মাইল গেলে পড়বে পরিত্যক্ত ট্রাক। তবে বাঁ দিকের জিনিসটার দিকে সুন্দরীকে নিয়ে চলল সে। ওটা না দেখে যাবে না। একটা নিচু টিবির পিছনে রাখল ট্রাক, বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।

'ক্যাপ্টেন নবী, আমার আরইসি৭টা দেবেন?' বলল নিশাত।

পাশেই স্বর্ণা, সিটের পাশের পকেট থেকে বের করল গ্লক ১৯ পিস্তল।

রিয়ার কমপার্টমেন্ট ডোর খুলল নবী, ওখান থেকে অস্ত্র নিয়ে বাড়িয়ে দিল নিশাতের দিকে। ওর নিজের হাতে গ্লক ১৯ পিস্তল।

ট্রাক থেকে নেমে এল ওরা। কুঁজো হয়ে এগোচ্ছে, দেখে নিচ্ছে চারপাশ। সামনের ওই জিনিসটা মরুভূমির মেঝে থেকে উঁচু হয়ে আছে। পঞ্চাশ গজ যেতেই শুনতে পেল বিশ্রী চিৎকার। কোনও মানুষ এ আওয়াজ ছাড়তে পারে না। তবে মিল আছে শিশুদের কান্নার সঙ্গে।

'ওটা কী?' চমকে গেল স্বর্ণা।

অন্য দু'জনের চেয়ে দু'ফুট সামনে হাঁটছে নিশাত। কাঁধে তুলে ফেলেছে রাইফেলের বাঁট। তীক্ষ্ণ চোখে ওদিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল জিনিসটা কী। মনে হলো ওটা উল্টো করে পোঁতা একটা ক্রস। ক্রসের দু'পাশে কালো দুটো আকৃতি নড়ছে।

তারপর বিস্তারিত হলো কালো দুটো ডানা। এবার বুঝতে পারল নিশাত, এক লোককে ক্রুসিফাই করা হয়েছে। পা দুটো আকাশের দিকে তাক করা, জমিনের দিকে মাথা। মানুষটার দুই হাতের পাশে বসেছে দুটো গলা ছেলা শকুন। বুকে ও ডানায় থকথকে রক্ত। লাশ থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটা শকুনের ঠোঁট থেকে ঝুলছে এক খণ্ড মাংস। দ্রুত ক'বার মাথা নাড়ল, গলা দিয়ে নামিয়ে দিল সুস্বাদু খাবার।

আগেও আফ্রিকায় জাতিসংঘের কাজে এসেছে নিশাত। ওর জানা আছে, গুলি ছুঁড়লেও সরবে না এই বিশ্রী পাখিগুলো। এরা সরে না লাশ থেকে। দু'বার গুলি করল নিশাত। লাশের পাশ থেকে ধুপ করে পড়ল দুটো শকুন। হালকা হাওয়ায় অলস ভঙ্গিতে উড়ে গেল কয়েকটা পালক।

'হায় আল্লাহ্!' বিড়বিড় করল স্বর্ণা।

দ্রুত পায়ে ক্রসের সামনে পৌঁছল ওরা। শকুনগুলো ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে লাশটাকে। কয়েক দিন ধরে খুবলে খাচ্ছে।

এ লোক এশিয়ান ছিল। হতে পারে উপমহাদেশীয়। কপালে গুলি খেয়ে মারা যায়। ক্রসের পায়ের কাছে যে পরিমাণ রক্ত, এ থেকে বুঝবার উপায় নেই লোকটাকে গুলি করে ঝুলিয়ে দিয়েছে, না কি ঝুলিয়ে পরে গুলি করেছে।

ওরা নিশ্চিত হয়ে গেল, এ আর্কিওলজিকাল টিমেরই কেউ।

মানুষটাকে খুন করেছে টেরোরিস্টরা। হয়তো প্রয়োজন বোধ করেছে। কিন্তু তার দেহকে অমানবিক ভাবে বিকৃত করা সম্ভব শুধু পশুর পক্ষেই।

কোনও কথা বলল না ওরা। সুন্দরীর ক্যাবে ফিরল নবী, নিয়ে এল বেলচা।

পঁচিশ মিনিট লাগল নরম বালিতে লাশ কবর দিতে। ততক্ষণ ট্রাকের চাকার দাগ খুঁজতে এগিয়ে গেল স্বর্ণা ও নিশাত। চাকার চিহ্ন গেছে পশ্চিম দিকে। তবে ট্রাক একটা নয়, ছিল দুটো। শেষেরটা ড্রিল ট্রাকের চেয়ে অনেক হালকা। কিছুদূর যেতেই দুই ধরনের দাগের মাঝে পাওয়া গেল একটা গুলির খোসা। পাশের জমিতে লালচে রঙের দাগ। এক এক করে বালি কণা সরাচ্ছে পিঁপড়ার দল।

ফিরে এসে কী পেয়েছে নবীকে বলল ওরা। আলাপ ছাড়াই সবাই বুঝল, অজান্তে সীমান্ত পেরিয়েছে আর্কিওলজিকাল টিম। এখানে এসে ধরা পড়েছে লিবিয়ান প্যাট্রলের হাতে। যে কারণেই হোক, তাদের একজনকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। বন্দি হিসাবে অন্যদেরকে নিয়েছে। মৃত মানুষটার লাশ ঝুলিয়ে দিয়েছে ক্রসে।

'হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর বিমান দেখে ফেলেছিল,' বলল নবী। 'বিমানটা বিপদে পড়েছে বুঝেই দেখতে আসে।'

'এদিকে আসার পর বন্দি হয় প্যাট্রলের হাতে,' মন্তব্যের সুরে বলল স্বর্ণা।

'তবে ওরা সীমান্ত-রক্ষী ছিল না,' বলল নিশাত। 'চারপাশে নজর রাখতে দল পাঠায় টেরোরিস্টরা। যাতে পরিষ্কার থাকে ফ্লাইট পাথ। লোকগুলোকে নির্দেশ দেয়, কেউ বিমান দেখে ফেললে তাকে মেরে ফেলতে হবে।'

'খুবই সম্ভব,' বলল স্বর্ণা। 'তবে এ-ও হতে পারে বাকি দু'জনকে বন্দি করে নিয়ে গেছে।'

'আর্কিওলজিকাল টিম যেখানে অ্যাম্বুশে পড়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় ওরা বেস ক্যাম্প থেকে অনেক দক্ষিণে সরে এসেছিল,' বলল নবী। 'ভুল জায়গায় হাজির হয়, ভুল সময়ে।'

'এবার কী করতে বলেন, আপা?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

সবার ভিতর সিনিয়র নিশাত সুলতানা। তা ছাড়া, তাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মাসুদ স্যর। এরপরও একবার ভাবল সোহেল আহমেদের সঙ্গে আলাপ করবে কি না। তবে ওই লাশের পচন দেখেননি তিনি। উনি বুঝবেন না ওই দৃশ্য কেমন লেগেছে ওদের তিনজনের। ট্যাকটিকাল বিষয়ে কখনও আবেগ থাকে না নিশাতের মনে। জানে, সত্যিকারের কোনও নেতা কখনও আবেগের বশে চলে না। কিন্তু সব জেনেও সঙ্গীদের মনের অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। ওই কসাইগুলোকে খুঁজে বের করবে। কপাল যদি ভাল থাকে, জীবিত পাবে দু'একজনকে। তাদের জানা থাকতে পারে কোথায় নেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এ মুহূর্তে যে-কোনও তথ্য পাওয়াই গুরুত্বপূর্ণ।

'আমরা ওদের পিছু নিতে পারি,' বলল নিশাত। 'আপনাদের কী মনে হয়?'

'চেষ্টা করে দেখলে মন্দ হয় না,' বলল স্বর্ণা।

'শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা বাংলাদেশিদের সঙ্গে নিয়েছে না,' বলল নবী। 'এখন তারা বন্দি।'

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল নিশাত। 'ট্রাকে উঠুন, আমরা পিছু

নেব।'

সুন্দরীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। ভারী ধরনের যান ড্রিল ট্রাক, গভীর দাগ ফেলে গেছে। মরুভূমিতে সর্বক্ষণ বইছে হাওয়া, তার পরেও বালির বুক থেকে মুছতে পারেনি গভীর চিহ্ন। সূর্যটা বহু দূরের পাহাড়ের ওপাশে ডুবে যেতেই এফএলআইআর সিস্টেম চালু করল নবী। জিনিসটা হেলিকপ্টারকে হামলা করবার জন্য। সামনের দিকে নজর রাখে ইনফ্রারেড সিস্টেম, কয়েক মাইল দূর থেকে পাওয়া যায় হিট সোর্স। সহজে ধরা পড়ে উত্তপ্ত ইঞ্জিন।

নাইট ভিশন গগলস পরে নিল নিশাত। ধরা পড়বে প্যাসিভ ও অ্যাক্টিভ নিয়ার-ইনফ্রারেড আলো। ওদের পিছনে মুখ তুলেছে আধ-খাওয়া চাঁদ। ওটা ভৌতিক আলো ফেলছে মরুভূমির উপর। তবে চারপাশ দেখা যায়।

মরুভূমির উপর দিয়ে ছুটে চলেছে সুন্দরী। কেউ কথা বলছে না। তবে একই বিষয় নিয়ে ভাবছে—প্রতিশোধ নিতে হবে ওই মৃতের হয়ে। একের পর এক ঝাঁকি লাগছে। তবে সে নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই ওদের। শক অ্যাবযর্ভার যদি সামলাতে না পারে, কী আর করা, নীরবে সহ্য করবে ওরা।

'আমরা তিউনিশিয়া সীমান্ত থেকে কতটা দূরে?' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল স্বর্ণা।

কমপিউটারে পজিশন দেখল নবী। 'আট মাইল।'

'মনে করি না লোকগুলো সীমান্ত পেরুবে,' বলল নিশাত।

ধূসর বালির উপর আধিভৌতিক আলো ফেলছে চাঁদ। মনে হয় ওটার সামনে উড়ছে বালির পর্দা। নিশাতের নাইট ভিশন গগলস পরিমিত আলো পেল না। কাজেই চালু করল অ্যাক্টিভ ইলিউমিনেটরগুলো। ওই আলো দেখবে না কেউ, তবে গগলস ওটা ধরবে।

আরও এক মাইল পেরুল সুন্দরী। নবী ভাল করেই জানে আপার গগলস সব দেখবে, নিজে এফএলআইআর থেকে চোখ সরাল না। এখন পর্যন্ত সামনের মরুভূমি ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্ক্যানে ধরা পড়ছে না কোনও থার্মাল ইমেজ।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ছোট্ট ব্লিপ। এতই খুদে, কোনও মানুষ হতে পারে না। ব্লিপ নিয়ে ভাবল না নবী, ওটা খুব ছোট কোনও প্রাণী।

কিন্তু ক' সেকেণ্ড পর আলোর বিস্ফোরণ হলো প্রতিটি ওয়েভলেন্থ-এ। কমপিউটার স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করে উঠল ধবধবে সাদা কিছু! পরক্ষণে নবী বুঝল, একযস্টের দীর্ঘ লেজ নিয়ে ছুটে আসছে আরপিজি!

রকেট মোটরের উজ্জ্বল প্রভা অন্ধ করে দিল নিশাতকে। চমকে গিয়ে খুলতে গেল গগলস। টের পেল, নিখুঁত আম্বুশের ভিতর পড়েছে! প্রতিপক্ষ এক সেকেণ্ড আগে গ্রেনেড লঞ্চ করলে হাজার টুকরো হয়ে যেত ওরা।

ষোলো

মাঝারি ঢিবির উপর দিয়ে চলেছে সুন্দরী, কিন্তু কাভার না পেলে এ সুবিধা কোনও কাজে আসবে না। গতির কারণে ব্যাক গিয়ার ফেলতে পারল না নিশাত। একমাত্র উপায় রইল এগিয়ে চলা। তীরের মত এল আনগাইডেড রকেট। নিশাত মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল, দ্রুত গতিতে নেমে চলেছে ঢাল

বেয়ে। ড্যাশ বোর্ডের বাটন টিপে নামিয়ে দিল সাসপেনশন। প্রসারিত হলো চাকাগুলো, ফেণ্ডারের আড়াল থেকে অনেকটা বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে।

বাম্পার নেমে গেল, .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান ব্যবহারের উপায় রইল না। অবশ্য দু' দিকে চাকা প্রসারিত হওয়ায় ভারসাম্য বেড়ে গেল ট্রাকের, ঝড়ের গতিতে নেমে যেতে লাগল ঢিবি থেকে। সহজে উল্টে পড়বে না। আরেকটা সুইচ টিপল নিশাত, পিছন বাম্পার থেকে নেমে গেল শেকলের পর্দা। ঝোড়ো গতিতে ছুটছে সুন্দরী, বালির ঘন মেঘ তৈরি করছে শেকলগুলো। তার ভিতর কিছুই দেখবে না গ্রেনেডিয়ারের নাইট ভিশন গগলস। কিন্তু সবই দেখবে এফএলআইআর।

ট্রাক তীরের মত ছুটছে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল, সেখানে এসে বিস্ফোরিত হলো রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড। তৈরি হলো বালির ফোয়ারা। আঁধার চিরে ছুটে এল ট্রেসার বুলেট। একেকটা অতি দীর্ঘ আগুনের ছুরি। খটাখট লাগছে বডিতে।

'স্বর্ণা...' থেমে গেল নিশাত।

'কাজে নেমে পড়েছি, আপা।'

পিছনের কার্গো দরজা খুলে ফেলেছে স্বর্ণা, পা দুটো সামনে রেখে বেরুল। পাশের সুইচ টিপতে খুলতে লাগল উপরের হ্যাচ। কবাট সরে যেতেই উপরের দিকে ঠেলে দিল দ্বিতীয় মেশিনগান, বসিয়ে নিল ক্যাবের ছাতের মাউন্টে। হ্যাচ কাভার দুটো দু'দিক থেকে কাভার দেবে। সরাসরি সামনে থেকে এল ট্রেসার। লোকটার অবস্থান বুঝে নিল স্বর্ণা, ওর দু'হাতের ভিতর গর্জন ছাড়ল .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। বিদ্যুদ্বেগে ব্রিচ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে ব্রাসের খোসা। দূরে এক জায়গায় আগুনের ফুলকি বেশি, ওদিকে বাড়তি মনোযোগ দিল স্বর্ণা। জানে না আঁধারে কী ঘটছে, তবে ক' সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে গুলি আসা

বন্ধ হলো।

এঁকেবেঁকে ছুটছে নিশাত, বাধ্য হয়ে স্বর্ণার ঘোরাতে হচ্ছে মেশিনগান। সামনে পড়ল শত্রুদের আরেকটা লাইন। এদের সঙ্গে রয়েছে আরেক গ্রেনেডিয়ার। মেশিনগানের গুলি লাগল তার হাতের লঞ্চারে। বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, ঝলসানির ভিতর দেখা গেল ছিটকে আকাশে উঠল কয়েকটা দেহ।

অন্ধকারে রওনা হয়েছে আরেকটা আরপিজি। তবে এত দূর দিয়ে, দ্বিতীয়বার ভাবল না নিশাত। দীর্ঘ এক ঢিবির দিকে চলেছে। ওখানে কাভার নিয়েছে আততায়ী দল। ত্যাড়চা ভাবে ঢিবির উপর উঠছে সুন্দরী। চূড়ায় উঠেই ফোর হুইল চালু করল নিশাত, কাত হয়ে আবার নেমে চলেছে। এক পাশে রইল লোকগুলো। সহজে তাদেরকে ক্রসহেয়ারে পেল স্বর্ণা। তারা যেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু করবার সময় পেল না, যেন কাস্তের সামনে পড়েছে গমের খেত। পিছনে ছিটকে পড়ল লাশগুলো।

'সামনে বিশাল থার্মাল ইমেজ,' কমপিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ তুলল না নবী।

'রেঞ্জ?'

'পাঁচ শ' গজ। টপোগ্রাফির কারণে চোখে পড়ছে না। তবে বড় কিছু। ক্ষণে ক্ষণে গরম হয়ে উঠছে।'

'মিসাইল?' জানতে চাইল নিশাত।

এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে ছুটছে সুন্দরী, কিন্তু একবারের জন্যও কি-বোর্ড টিপতে ভুল করছে না নবীর আঙুলগুলো। ট্রাকের দু' পাশ থেকে খুলল হাইড্রোলিকালি অপারেটেড প্যানেল, বেরিয়ে এল ভোঁতা মুখের চারটে এফজিএম-১৪৯ জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল। কাঁধের উপর লঞ্চার রেখে ব্যবহার করতে হয়। জ্যাভেলিনের ওয়ারহেড সাতেরো পাউণ্ডের। অনায়াসে ধ্বংস করে যে-কোনও আর্মার্ড

ভেহিকেল।

জ্যাভেলিন ইনফ্রারেড গাইডেড মিসাইল, একবার লক্ষ্য নির্ধারণ করলে ওটাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় না। না দেখা উত্তাপের উপর কমপিউটারের টার্গেটিং রেটিকল লক করল নবী, প্রস্তুত রইল মিসাইল।

'মিসাইল!' স্বর্ণার জন্য এক সেকেণ্ড দেরি করল নবী, তারপর লঞ্চ করল রকেট।

টিউব থেকে বেরিয়ে গেল মিসাইল, প্রচণ্ড উত্তপ্ত একযস্ট পিছনে ফেলে মরুভূমি পেরুতে লাগল। একদল লোক একপাশ থেকে গুলি ছুঁড়ছে সুন্দরীর দিকে। বনবন স্টিয়ারিং ঘোরাল নিশাত, সুযোগ করে দিল স্বর্ণাকে। বিশ্রী আওয়াজে আবার চালু হলো মেশিনগান। কারও কোনও আর্তচিৎকার নেই, তবে ক' সেকেণ্ড পর থেমে গেল গুলি।

চারপাশের গোলাগুলি যেন কিছুই নয়, সগর্জনে উড়ে চলেছে জ্যাভেলিন, জানে, কোনটা তার টার্গেট। প্রতিপক্ষের কয়েকজন গুলি করে থামাতে চাইল একগুঁয়ে মিসাইলটাকে, কোনও ফলাফল পেল না। টার্গেটের পঞ্চাশ ফুটের ভিতর পৌঁছে গেল জ্যাভেলিন, তারপর হঠাৎ হারিয়ে বসল সিগনাল। পরক্ষণে আরেকটা সিগনাল পেল, তবে ওটা অনেক কম উষ্ণ। জিনিসটাও কাছে। তবে ওদিকে মনোযোগ দিল না জ্যাভেলিন, ছুটতে লাগল নির্ধারিত কোর্সেই।

মিসাইলের ইলেকট্রনিক মগজ জানে না, সঠিক টার্গেট ও তার মাঝে হাজির হয়েছে একটি ফিউয়েল ট্রাক। ওটার চলন্ত ইঞ্জিনকে কম উষ্ণ ইমেজ ভাবছে জ্যাভেলিন। তবে গতিপথ পরিবর্তন হলো না, ক্যাবের পিছনে ট্যাঙ্কের উপর আছড়ে পড়ল মিসাইল। প্রচণ্ড তাপ ও আগুনে বিস্ফোরিত হলো ফিউয়েল, মুহূর্তে মরল ড্রাইভার। কমলা আগুনের প্রকাণ্ড গোলক উঠে গেল আকাশে।

খানিক দূরে ছিল ন'টা তাঁবু, বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হলো সব। ফিতার মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল গাই রোপ। ভেঙে পড়ল খুঁটিগুলো। এ কম্পাউণ্ডকে স্যাটালাইটের হাত থেকে রক্ষা করতে কার্গো নেটিং দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। তার উপর ছিল খেজুর পাতার আচ্ছাদন—আগুনে ছাই হয়ে গেল এক পলকে। টুকরো টুকরো হলো ট্রাক, চারপাশে ছড়িয়ে গেল শ্র্যাপনেল। আশপাশে যত গ্রাউণ্ড ক্রু ছিল, কিমা হয়ে গেল। তবে তারা যে মেশিন সার্ভিসিং করছিল, ওটার কিছুই হলো না।

বিধ্বস্ত ট্রাকের বিশাল আগুনে একই সঙ্গে দুটো বিষয় দেখল নিশাত-নবী-স্বর্ণা। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ফলে কাত হয়ে পড়েছে আর্কিওলজিস্টদের ড্রিল ট্রাক, আগুন ধরে গেছে আণ্ডার ক্যারিজে। আর, দ্বিতীয় জিনিসটা ভয়ঙ্কর। প্রহরীরা ওটাকে আড়াল দিয়েছিল। বালির বস্তা দিয়ে তৈরি বাঙ্কারের ভিতর বসে আছে রাশান এমআই-২৪ হেলিকপ্টার গানশিপ। ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটলফিল্ড কপ্টার, বলা হয় ফ্লাইং ট্যাঙ্ক। যে উষ্ণতা টের পেয়েছে নবীর এফএলআইআর, ওটা এসেছে ইসোতভ টারবাইন থেকে। দ্রুত ঘুরছে পাখা। শিকার ধরতে উড়াল দিতে চলেছে পাইলট!

'হায় আল্লাহ্!' বলে উঠল নবী। 'ওটা যদি ওড়ে, আমরা শেষ!'

ওটার মিলিটারি কোড নেম হিন্দ। নবী কথা শেষ করবার আগেই মাটি ছাড়ল গানশিপ, ঘুরল। ওটার এক পাশ এখনও বালির বস্তার আড়ালে। পরক্ষণে উপরে উঠল হিন্দ, নাকের নীচের গ্যাটলিং গানের চারটে ব্যারেল থেকে শুরু হলো গুলিবর্ষণ।

তার দু' সেকেণ্ড আগে হ্যাচ দিয়ে নেমে পড়েছে স্বর্ণা। সুন্দরীর চারপাশের মরুভূমি বলকে উঠল .৫০ ক্যালিবারের গুলিতে। বুলেটপ্রুফ উইণ্ডশিল্ডে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য খুদে নক্ষত্র।

এভাবে গুলি চললে আগামী কয়েক সেকেণ্ডেই চুরচুর হয়ে খসে পড়বে কাঁচ।

গিয়ার ফেলল নিশাত, চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। লাফ দিয়ে রওনা হলো সুন্দরী, পিছনে তৈরি হলো বালি-ঝড়। বামদিকের জমি বিস্ফোরিত হলো, ট্রাকের পিছু নিয়েছে বুলেট সারি। পরক্ষণে হিন্দের খাটো ডানার নীচের পড থেকে লঞ্চ করা হলো আধ ডজন রকেট। সুন্দরীর ভিতর ওদের মনে হলো যেন মরুঝড়ের ভিতর পড়েছে। ওসব মিসাইল গাইডেড নয়, চারপাশের ঢিবির উপর নেমে এল। প্রতিটি বিস্ফোরণের মাঝে এঁকেবেঁকে সরতে চাইল নিশাত, আশা করল খানিক বাড়তি সময় পাবে। একটা রকেট লাগল পিছনের বাম্পারে, ঝাঁকি খেল ট্রাক। তবে কঠিন স্টিলের বড় কোনও ক্ষতি হলো না।

নবীর দিকে চাইল নিশাত। 'আপনি তৈরি?'

'হ্যাঁ!'

স্টিয়ারিং হুইল বামদিকে ঘুরিয়ে দিল নিশাত, পরক্ষণে প্রচণ্ড চাপ দিল ব্রেক প্যাডেলে। বালির উপর পুরো ঘুরে গেল সুন্দরী, কাত হয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। হিন্দের পিছন দিকে চলে এসেছে ট্রাকের নাক। দুটো জ্যাভেলিন ছুঁড়ল নবী। হাতে সময় কই যে লক্ষ্য-স্থির করবে, প্রার্থনা করল মিসাইলের হিট সিকার খুঁজে নেবে গানশিপকে।

বালি-ঝড়ের ভিতর টার্গেট হারিয়ে ফেলেছে পাইলট, আপাতত ছুঁড়ল না গুলি বা রকেট। নীচে চেয়ে খুঁজছে ট্রাক। জানা কথা, বালি-কণা সরলেই হাতের মুঠোর ভিতর পাবে শত্রুকে। কিন্তু নীচের ওই মরুঝড়ের ভিতর থেকে ছিটকে উঠল দুটো মিসাইল। মরুভূমির বালি এখনও যথেষ্ট তপ্ত, দুই মিসাইলের একটার ক্রায়োনিক কুলিং সিস্টেম পরিমিত তাপমাত্রা নির্ধারণে ব্যর্থ হলো—দিক হারাল ক্ষেপনাস্ত্র, খানিক দূরের ঢিবির

উপর বিস্ফোরিত হলো।

ইনকামিং রকেটের দিকে নাক তাক করল হিন্দ। ওটার দেহ আড়াল দেবে টারবাইনের একযস্টকে, ফলে থার্মাল ইমেজ কম হবে। পাইলট এটা ভাল করেই জানে, কিছুই করল না সে। আশা করছে, চুপচাপ অপেক্ষা করলে এমনিতেই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে জ্যাভেলিন। জানে না, টার্গেট লক-ইন করেছে মিসাইল। কমপিউটার মগজ দেখছে হেলিকপ্টারের থুতনির নীচে চারটে জ্বলজ্বলে টিউব। খুব উত্তপ্ত ওগুলো!

মিসাইলের ফিনগুলোকে সামান্য কারেকশান দিল হিট সিকার, হিন্দের গ্যাটলিং গানের তপ্ত ব্যারেলগুলোকে সরাসরি নিশানা করল। শেষ দু' সেকেণ্ডে সরে যেতে চাইল পাইলট, ফলে গ্যাটলিঙের ব্যারেল পেল না জ্যাভেলিন, বিস্ফোরিত হলো ঠিক ককপিটের নীচে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দু' টুকরো হয়ে গেল হিন্দ। সামনের অংশ গুঁড়ো হলো। এদিকে হাল ও টেইল বুম ছিটকে পিছনে সরল। মেইন রোটর দ্রুত ঘুরছে, সব ভারসাম্য হারিয়ে বসল কপ্টার—চরকির মত ঘুরতে লাগল। যেটা ককপিট ছিল সেই গর্তের ভিতর থেকে বেরুতে লাগল ঘন কালো ধোঁয়া। নব্বুই ডিগ্রি কাত হয়ে উপরের দিকে উঠল হিন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কাটার ক্ষমতা হারাল পাখাগুলো। মরুভূমির উপর জগদ্দল পাথরের মত নেমে এল দশ টনি কপ্টার। বালির ভিতর গাঁথল অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। পরক্ষণে ছিঁড়েখুঁড়ে নানা দিকে ছুটল। শ্র্যাপনেলের গতি হলো প্রায় সুপারসনিক। একগাদা বালি ঢুকল ইসোতভ টারবাইনের ভিতর, সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হলো ওটা।

কপ্টারের সেলফ-সিলিং ফিউয়েল ট্যাঙ্ক তার কাজ সঠিক ভাবেই করল, বিস্ফোরিত হলো না। ফিউয়েলের অভাবে দ্রুত নিভে গেল ইঞ্জিনের একযস্ট।

বড় করে শ্বাস ফেলল নবী।

'ভাল দেখিয়েছেন, ক্যাপ্টেন নবী,' বলল নিশাত। ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল, 'স্বর্ণা? তোমার কী অবস্থা?'

'ভয় কাটিয়ে উঠছি।'

'ভয় পাওয়ার মেয়ে তুমি নও।'

ক্যাবের ভিতর মাথা ঢোকাল স্বর্ণা। 'নিজ চোখে দেখলাম আপনারা একটা হিন্দ ফেলে দিলেন। এটা কী করে সম্ভব হলো? তার চেয়ে বড় কথা, এ এলাকা কোথায়? এটা কোনও সীমান্ত ফাঁড়ি?'

'হতে পারে,' বলল নিশাত।

'আপা, হিন্দের কাছে চলুন,' বলল নবী। এফএলআইআর-এর মাধ্যমে ভূ-পাতিত কপ্টার দেখছে সে।

'কাজটা ঠিক হবে না,' বলল নিশাত। 'এবার লেজ তুলে ভেগে যাওয়া উচিত।'

'মনে করি না এটা সীমান্ত ফাঁড়ি,' বলল নবী। 'কাছ থেকে হিন্দ দেখলে বুঝব এরা কারা। তা ছাড়া, নিশ্চিত হতে হবে চারপাশে কমিউনিকেশন গিয়ার আছে কি না। জীবিত কেউ থাকলে নিজেদের লোক ডেকে আনবে। সেক্ষেত্রে বিপদে পড়ব।'

গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল নিশাত। সিকি মাইল দূরে পড়েছে গানশিপ। তিন মিনিটে পৌঁছে গেল সুন্দরী। তখনও থামেনি, তার আগেই দরজা খুলে নেমে গেল নবী। নিজের অজান্তেই কুঁজো হয়ে গেছে। শিকারী যেমন হাজারো বছর আগে বিপজ্জনক শিকারের দিকে চাইত আর ভাবত, ওটা এখনও বেঁচে থাকতে পারে, সেভাবে চাইল হিন্দের দিকে। সাবধানী পায়ে পৌঁছে গেল ওটার পাশে। এদিকে হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে গেছে স্বর্ণা, মেশিনগান হাতে চেয়ে রইল ধূমায়িত ধ্বংসাবশেষ ও ক্যাম্পের দিকে।

'কী খুঁজছেন?' জানতে চাইল।

'খুঁজছি না, দেখছি,' বলল নবী।

'সেটা কী তা-ই না হয় বলুন?'

'এয়ার ইনটেক সাধারণ নয়। ওগুলো আকারে বেশ বড়। তা ছাড়া, রোটর ব্লেডের স্টাব দেখবার মত।'

'তাতে?' ট্রাকের ক্যাব থেকে জানতে চাইল নিশাত।

ঘুরে চাইল নবী। 'আপা, এই কপ্টার মডিফাই করা হয়েছে অল্টিচ্যুড পেতে। বাজি ধরতে পারি, টারবাইনের লাইনগুলো চেক করলে দেখব স্বাভাবিকের চেয়ে বড়। আর এটার...' গানশিপের ডানায় হার্ড-পয়েন্ট মাউন্টে চাপড় দিল। 'এখানে রাখত এএ-৭ অ্যাপেক্স মিসাইল।'

'তাতে কী?'

'অ্যাপেক্স হিন্দের টিপিকাল লোড-আউট নয়। এসব গানশিপ আসলে গ্রাউণ্ড-অ্যাটাক কপ্টার। কিন্তু অ্যাপেক্স ডিজাইন করা হয় এয়ার-টু-এয়ার কমব্যাটের জন্য। বিশেষ করে এমআইজি-২৩ ফ্লোগারের কারণে।'

'আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'আমি ওয়েপন্স ডিজাইনের উপর ট্রেইনিং নিয়েছি। আপনারা যেমন দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করতে পারেন, তেমনি করে বলতে পারি, এই গানশিপে অ্যাপেক্স ছিল।'

'এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, হাই অল্টিচ্যুড গানশিপ...' যেন আনমনে বলছে নিশাত। কথাগুলোকে তুলা দণ্ডে তুলে ধরছে। 'খুব রহস্যজনক কিছু নয় যে শার্লক হোমসকে লাগবে। গানশিপের মিসাইল দিয়েই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমানকে নামানো হয়েছে।'

জানতে চাইল স্বর্ণা, 'এ এলাকা কি লিবিয়ান আর্মির, না ভোগ-দখল করছে টেরোরিস্টরা?'

'লাখ টাকার প্রশ্ন করেছেন,' বলল নবী। ফিরল সুন্দরীর

ক্যাবে। 'চলুন দেখি এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় কি না।'

মরু-ক্যাম্পের দিকে ফিরছে সুন্দরী। প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁবুগুলো, পুড়ে ছাই হয়েছে খেজুর পাতা। এক পাশে খোলা মরুভূমি, আরেক দিকে লণ্ডভণ্ড ক্যাম্প। হিন্দের এক মেকানিকের লাশের পাশে থামল সুন্দরী। নেমে গেল নবী, চিত করল লাশটা। দূরের আগুন থেকে আসছে লালচে আভা। লোকটা গুলি খেয়ে মরেনি। ফিউয়েল ট্রাকের ট্যাঙ্ক থেকে এক টুকরো লোহা গেঁথেছে বুকে। ইউনিফর্মে কোনও ইনসিগনিয়া নেই, আইডেন্টিফিকেশনও নেই। এমন কী ডগ ট্যাগও অনুপস্থিত।

আরও কয়েকটা লাশ পরীক্ষা করল নবী, তবে সুন্দরীর আড়াল থেকে বেশি দূরে গেল না। কারও র‍্যাঙ্ক বা আইডি নেই। বিধ্বস্ত তাঁবুর ভিতর খুঁজল। একটা স্যাটালাইট ফোন পাওয়া গেল। ওটা পকেটে রেখে দিল। পাশের তাঁবুর ভিতর মিলল বড়সড় ট্র্যান্সিভার, তবে ভয়ানক বিস্ফোরণে বিকল। এসব তাঁবুর ভিতর এমন কিছু নেই যা দেখে বুঝবে এরা কারা, বা কাদের হয়ে কাজ করত।

'কী বুঝলেন?' নবী ক্যাবে উঠতেই জানতে চাইল নিশাত।

'আমরা জানি এয়ারবাসকে কীভাবে নামানো হয়েছে, কিন্তু বোঝা গেল না এই গোপন ঘাঁটি কাদের,' হতাশ স্বরে বলল নবী।

'এ নিয়ে ভাবছি না,' বলল নিশাত। রওনা হয়ে গেল তিউনিশিয়া সীমান্ত লক্ষ্য করে। 'এসব প্রশ্ন নিয়ে কাজ করছেন মাসুদ স্যর। কপ্টার নামলে পাঁচ মিনিটের ভিতর জেনে যাবেন ওরা কারা।'

সতেরো

হেলিকপ্টারের শামুক দরজা খুলে যেতেই ধাঁধিয়ে গেল রানার চোখ। বাইরে অত্যুজ্জ্বল রোদ। খর দাবদাহের ভিতর বইছে লূ-হাওয়া। মনে মনে বলল, *পৌঁছে গেলাম। এবার চারপাশ দেখে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।*

লিবিয়ান এয়ার বেসে হারিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। ক্যাম্পে বোধহয় থাকবে হাজারখানেক লোক। মিলিটারি পারসোনেল যে যার ডিউটি করবে। নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে যাবে, আবার ফিরবে নিজ ব্যারাকে। বারো-চোদ্দটা দালান চোখে পড়ছে। সেগুলোর ভিতর লুকাতে পারবে। এত লোকের ভিতর উধাও হওয়া সোজা।

কিন্তু এমআই-৮ কোনও এয়ার ফোর্স ফ্যাসিলিটিতে নামেনি। এ জায়গা উঁচু মালভূমি। বহু নীচে একের পর এক সবুজ উপত্যকা। দেখতে অপূর্ব লাগছে। দুরমুজ করা শক্ত মাটিতে নেমেছে কপ্টার, নীচে ট্রেইনিং ক্যাম্প। সবার সঙ্গে কপ্টার থেকে নামতে হবে, একটু দ্বিধা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা কয়েক তাঁবু। পাশেই প্যারেড ফিল্ড, অবস্ট্যাকল কোর্স ও শুটিং রেঞ্জ।

কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছল না রানা। মন বলছে, এটা লিবিয়ার জমিতে কোনও টেরোরিস্ট ক্যাম্প। অনুদান নেই সরকার থেকে।

কমপাউণ্ডের একদিকে লোহার কলাম ও বিম দিয়ে তৈরি তিনতলা দালান বোধহয় বড়সড় অফিস ব্লক। সামনে গোলাকার ড্রাইভওয়ে। দূর দিয়ে ঘেরা উঁচু দেয়াল। দালানের পিছন জমিতে

গাছ নেই, বদলে কারুকাজ করা তারকাঁটার বেড়া, হঠাৎ দেখলে মনে হয় হেজব্রাশের ঝোপঝাড়।

থামছে কপ্টারের টারবাইন। দূর থেকে এল জেনারেটারের কর্কশ আওয়াজ। আযান শুরু করেছেন মুয়াজ্জিন। দালানগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে সবাই, হাতে জায়নামাজ। প্যারেড গ্রাউণ্ডে জড় হচ্ছে, মক্কা শহরের দিকে জায়নামাজ পেতে নেয়া হচ্ছে। আন্দাজ করল রানা, এখানে রয়েছে দু' শ'র মত লোক। কিন্তু এত কম মানুষের ভিতর অচেনা থাকা অসম্ভব। এখন হোক বা খানিক পর, সত্যিকারের সোবহানকে খুঁজবে কেউ। দল বেঁধে খুঁজতে বেরুবে সবাই।

যত দ্রুত সম্ভব এদের সম্পর্কে তথ্য দরকার। কিন্তু এখানে লুকাতে পারবে না। আগে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, তারপর ফিরবে রিকনেসেন্স করতে।

'পা বাড়াও,' সামনে থেকে নির্দেশ এল।

সবার শেষে র‍্যাম্প বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। চোখ পড়ল নীচের উপত্যকার উপর। ওখানে কনস্ট্রাকশন বা মাইনিং চলছে। ভাল করে পেঁচিয়ে নিল কাফিয়ে, সরু মেটো পথ ধরে নামতে লাগল ক্যাম্পের দিকে। শেষ জনের পিছু নিয়েছে। আশা করছে, কেউ চট্ করে সন্দেহ করবে না।

ভূ-পাতিত বিমানকে যারা স্যাবোটাজ করল, তারা একই ব্যারাকের কি না, জানা নেই। নিজেদের ভিতর খুব একটা কথা বলেনি। তবে আন্দাজ করা যায়, একই ব্যারাকের। একইসঙ্গে ট্রেইনিং নিয়েছে, শৃঙ্খলা শিখেছে। পরস্পরকে ভাল করেই চেনে, নিজ ব্যারাকে ফিরলে শুরু হবে আলাপ। তার মানে, সন্দেহ নেই, কিছুক্ষণের ভিতর ধরা পড়ছে ও। যেভাবে হোক, পালাতে হবে।

মনে মনে হিসাব কষছে রানা। গিরিখাদের পাশে মেটো পথ, বৃষ্টিতে ধসে পড়েছে একপাশ। এ-পথে নামলে ড্রেনের মত সরু

নালা, ফস্কা বালি, নুড়ি-পাথর ও বড়সড় বোল্ডার এড়িয়ে নামতে হবে। পা পিছলালে পড়বে গিয়ে অনেক নীচে পাথুরে জমিনের উপর। টিলার মাঝে কার্নিশ আছে তবে সেখানে নামা খুব কঠিন। নামতে যদি পারেও, তারপর বাকি তিরিশ ফুট দেয়ালের মত খাড়া। নীচের পাথরে আছড়ে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু।

দলটি পিঁপড়ার মত নেমে চলেছে, সামনে তাদের নেতা। হঠাৎ থমকে গিয়ে নির্দেশ দিল সে। সবার কাফিয়ে জমা নেবে।

রানা ছাড়া সবাই জানে এটাই ক্যাম্পের নিয়ম। লোকগুলো আগেই মাথা থেকে কাফিয়ে খুলতে শুরু করেছে। একবার চট্ করে বামদিকে ক্যাম্পের দিকে চাইল রানা। ওদিকে কারও মাথায় কাফিয়ে নেই। ওর মনে পড়ল, এ জিনিস দেয়া হয় নিজেদের ভিতর আন্তরিকতা বাড়ানোর জন্য। আরেকটি কারণ, বাইরের কেউ চট্ করে চিনবে না। এখন ক্যাম্পের ভাইদের ভিতর তারা নিরাপদ। নিশ্চিন্তে নিজেদের মুখ দেখাবে!

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ভাগ্যদেবী!

হাতের তালুর পাশ দিয়ে সামনের লোকটার পিঠে জোর ধাক্কা দিল রানা। চাপা স্বরে বলল, 'অ্যাই, সাবধানে চলবে!'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, সরু হয়ে গেছে দুই চোখ। 'এটা করলে কেন?'

'আমার পেটে গুঁতো দিলে কেন!' ধমকে উঠল রানা। 'এই অপমানের জবাব তোমাকে খুন করা।'

'পিছনে কী হচ্ছে?' ধমক দিল নেতা।

'এই শুয়োরের বাচ্চা আমাকে অপমান করেছে!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'তুমি কে বলছ?' জানতে চাইল নেতা। 'চেহারা দেখাও।'

'আগে এই শুয়োরের বাচ্চার মাফ চাইতে হবে।'

'কক্ষনো না। প্রথমে তুমি আমার পিঠে গুঁতো দিয়েছ।'

অলস ভঙ্গিতে আরবের মুখে হাত ঘুরিয়ে একটা বিরাশি সিক্কা বসানোর ভঙ্গি করল রানা। পুরো শক্তির দশ ভাগের এক ভাগ খরচ করেছে। লোকটা অনেক আগেই ঘুসিটা আসতে দেখেছে, উবু হয়ে এড়িয়ে গেল। জবাবে দুটো মাঝারি ঘুসি বসিয়ে দিল রানার পেটে। নিজের জন্য কৈফিয়ত দরকার ছিল রানার। হ্যাঁচকা টানে লোকটার কাফিয়ে খুলল, দুই হাতে তাকে ঘুরিয়ে দিল। এখন ওর নিজের পিঠ অন্যদের দিকে। কেউ দেখবে না মুখ।

'আমি তো তোমাকে চিনি না!' বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'এই লোক নকল! গোপনে আমাদের দলে ঢুকেছে!'

'তুমি পাগল না কি! আমি এখানে আট মাস ধরে আছি!'

'মিথ্যুক!' গর্জে উঠল রানা।

ধাক্কা দিয়ে ওকে সরাতে চাইল আরব। বাধা দিল না রানা, তবে তাল সামলানোর ভান করে শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলল প্রতিপক্ষের একটা বাহু, পথ থেকে সরে গেল। টের পেয়েছে হড়কে গেছে দুই পা। জঙ্গিকে নিয়ে পড়ছে। মালভূমির প্রান্তে পৌঁছেই মাথার উপর দিয়ে লোকটাকে থ্রো করল। নিজেও দড়াবাজের মত ঘুরে গেছে। খাড়া নালার ভিতর পড়েছে আরব। তবে তার উপর আসীন হয়েছে রানা, চোখা পাথর এড়াতে শুয়ে পড়ল লোকটার বুকের উপর।

নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল দুজন, সঙ্গে চলেছে নুড়ি-পাথরের ঢল। ওই আওয়াজ ছাপিয়ে একটা মুটমুট শব্দ পেল রানা। হাড় ভাঙছে জঙ্গির। কানের কাছে বিকট চিৎকার জুড়েছে। নালা বেয়ে নেমে যাওয়ার গতি বাড়ল। ওরা যেন ববস্লেডে চড়েছে, তবে তফাৎ, স্লেড হয়েছে আরব টেরোরিস্ট। উপর থেকে ও দু'পাশ থেকে খসে পড়ছে অসংখ্য পাথর। দ্রুত গতিতে নামছে ওরা। উড়ছে প্রচুর ধুলো। উপর থেকে ওদেরকে দেখবে না কেউ। উঠে বসবার চেষ্টা করছে দু'জনই। তবে পড়বার গতি অস্বাভাবিক

বেশি। এ মুহূর্তে থামা অসম্ভব। লোকটার বুকে চেপে বসে একবার এপাশ একবার ওপাশ কাত হয়ে নালা বেয়ে বিদ্যুদ্বেগে নামছে রানা। দু'হাতে ভারসাম্য রাখতে চাইছে, যেন নালার মাঝখানে থাকতে পারে।

উপর থেকে ঝরঝর করে পড়ছে পাথর, আগেরগুলোর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। হঠাৎ রানা টের পেল, ওরা আছে অ্যাভালাঞ্চের ভিতর। ওর চোখের সামনে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে নুড়ির নীচে চাপা পড়ছে আরব। পতনের গতি আরও বাড়ল। চোখের পলকে বামে বাঁক নিল নালা, তারপর আর বাড়তি পাথর বইতে পারল না। পাড় ছাপিয়ে উঠল পাথরের ঢেউ। যেন বন্যা শুরু হয়েছে নদীতে। নীচে চেয়ে বুক শুকিয়ে গেল রানার। ওদের নীচে শুধু শূন্যতা!

আর কোনও আওয়াজ করছে না আরব টেরোরিস্ট। লোকটার সঙ্গে শূন্যে ভেসে উঠল রানাও, তারপর শুরু হলো পতন। পিছু নিল পাথরের অ্যাভালাঞ্চ। নতুন এক নালার ভিতর ধপ করে পড়ল ওরা। এই নর্দমা আগের চেয়ে চওড়া ও গভীর, তবে একটু পর পরই বাঁক। অ্যাভালাঞ্চ আবারও ধরে ফেলল ওদেরকে। মানুষ যেভাবে নদীতে গাছের গুঁড়ির উপর বসে, সেভাবে আরবের উপর চেপে বসেছে রানা। নীচের কার্নিশ পেরিয়ে পাথর ঝরছে জলপ্রপাতের মত। মালভূমির উপর থেকে ওই কার্নিশ দেখেছে রানা। একবার সাহস করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। নুড়ি-পাথর, বালি ও বোল্ডার তেড়ে আসছে মাধ্যাকর্ষণের টানে। বোল্ডারগুলো পড়বার সময় পরস্পরের ভিতর ঠোকাঠুকিও করছে।

আবার নীচে চাইল রানা। কিনারা পেরিয়ে ছিটকে পড়ছে বোল্ডার, তারপর সোজা নীচে পাথুরে জমি। এই প্রস্তর-প্রপাত যদি জলপ্রপাত হতো, ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপ দিত রানা। সম্ভাবনা ছিল প্রাণ নিয়ে সাঁতরে বেরুতে পারবে। কিন্তু এখানে বাঁচবার কোনও সুযোগ নেই।

নুড়িপাথরের চলমান স্রোতের ভিতর হাত গাঁথতে চাইল রানা, পাঁচ সেকেণ্ড পর টের পেল, নীচে কঠিন জমিন। আর কয়েক মুহূর্ত পর কিনারা থেকে খসে পড়তে হবে। খাদের পনেরো ফুট বাকি থাকতে শেষ চেষ্টা করল রানা। টেরোরিস্টের লাশের উপর উঠে দাঁড়াল, বেকায়দা লাফ দিয়ে নামল অ্যাভালাঞ্চের উপরের দিকে। চার হাত-পা দিয়ে পড়ল, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে চাইছে। পায়ের নীচে সরসর করে সরছে পাথরের প্রবাহ। যতই চেষ্টা করুক, এক ইঞ্চি এগুতে পারল না রানা। অ্যাভালাঞ্চের গতি ঢের বেশি।

পাথরের সঙ্গে নীচে গিয়ে পড়লে?

বাঁচবার একমাত্র উপায় এখন নালার পাড়ে ওঠা। সেক্ষেত্রে সরতে পারবে পাথর-ধস্ থেকে।

পাথর ও বালির প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিক্ষত লাশকে।

কিনারা থেকে দশ ফুট বাকি থাকতে অ্যাভালাঞ্চের ভিতর দুই হাত ভরল রানা, সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত হলো আঙুলগুলো। প্রাণপণে পিছনে ছুঁড়ছে দুই পা। বেরুতে হবে পাথরের স্রোত থেকে। তবে দেহে এত শক্তি নেই যে জিতবে। হুড়মুড় করে নেমে আসছে পাথর, তার ওপাশে যেতে পারছে না শত চেষ্টা করেও।

হাল না ছেড়ে চেষ্টা চালিয়ে গেল রানা, দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইল জমিন। তারপর নুড়ি পাথরগুলোর ভিতর দিয়ে জমির ছোঁয়া পেল। শক্ত কী যেন ঠেকল হাতে। ডান হাতে খপ করে ধরল ওটা, বাম হাতে সরতে চাইল অ্যাভালাঞ্চ থেকে।

হাতে ওটা কিশোর বট গাছ। নীচে পড়বার সময় ওটাকে দেখেনি রানা। আবারও পিছলে যাওয়ার আগেই দুই হাতে শক্ত করে ধরল। ডানে সরতে চাইছে। কিন্তু দু'ফুট যেতেই মটকে গেল কাণ্ড। বাধ্য হয়ে মোটা একটা শিকড় ধরল রানা। ওটা অনেক জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

রক ক্লাইম্বিঙের প্রথম শর্ত: কোনও গাছকে বিশ্বাস করবে না।

ওটা যে কোনও সময় উপড়ে আসবে।

তবে এ মুহূর্তে রানার সামনে দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

প্রাণপণে ধরল শিকড়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে জমি থেকে উঠে আসতে চাইল ওটা। এদিকে অ্যাভালাঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওর উর্ধ্বাঙ্গ, বাকি রইল দুই পা। ভরসা রাখতে পারছে না শিকড়ের উপর। মূল শিকড়ের চারপাশের শিরাগুলো চড় চড় করে উঠে আসছে, দীর্ঘ হচ্ছে শিকড়। বারবার ঝাঁকি খেয়ে নীচের দিকে নামছে রানা।

কার্নিশটাকে পেরিয়ে গেল দুই পা। তারপর কোমর। শক্ত করে ধরে রইল শিকড়। মাত্র এক ফুট পাশ দিয়ে ছিটকে পড়ছে নুড়ি-পাথর, বালি ও বোল্ডার। ক' সেকেণ্ডের জন্য পতন থামল। আঙুলের সমান মোটা শিকড়, বেয়ে উঠতে চাইল রানা, কিন্তু তাতে পড়পড় করে উপড়ে আসতে চাইল। একবার নীচের দিকে চাইল। পরক্ষণে কিনারা পেরিয়ে সড়াৎ করে নেমে এল। আগেই দেখেছে, এবার বালি-নুড়ি-বোল্ডার এদিকে পড়বে।

টিলার দেয়াল থেকে আধ ইঞ্চি দূরে ওর নাক। স্থির হওয়ার সময় নিল না রানা, এক সেকেণ্ড পর দোলা দিয়ে ডানদিকে সরতে চাইল। মাথা ও কাঁধে পড়ছে ছোট নুড়ি-পাথর ও বালি। তিন সেকেণ্ড পর পাশে নামল বড় পাথরের ধস। মাঝারি এক পাথর কাঁধে পড়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। শিকড় থেকে পেণ্ডুলামের মত দুলছে রানা। কোনও ফাটল বা ফুলে থাকা পাথর খুঁজছে। খাড়া টিলার গা থেকে বেরিয়েছে মুঠো সমান এক পাথর। বার তিনেক দুলে ওখানে পৌঁছল রানা, ডান হাতে খপ করে ধরল পাথর।

বেশি দুলতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে। উপরের ক্ষুরধার কিনারা লেগে ছিঁড়ছে শিকড়। বেলে-পাথরটা ঠিক ভাবেই ধরেছে, কিন্তু পট করে ছিঁড়ে গেল শিকড়। টিলার বুকে আছড়ে পড়ল রানা। বালি ও পাথরের সঙ্গে দ্রুত নেমে গেল শিকড়ের টুকরো।

ডান হাতে পাথর ধরে ঝুলছে মরিয়া রানা। অসহায় ভাবে নীচের দিকে চাইল। প্রথমে ভাবল টিলার দেয়াল কাঁচের মত মসৃণ, একদম দেয়ালের মত খাড়া—কিন্তু না, পায়ের দু' ইঞ্চি নীচেই সরু তাক। হয়তো ওখানে দাঁড়াতে পারবে।

এদিকে হাত থেকে ফস্কে যেতে চলেছে পাথরটা!

বারকয়েক শ্বাস নিল রানা, তারপর আস্তে করে নেমে গেল তাকে। জুতোর হিল দুটো বেরিয়ে রইল। এই দীর্ঘ পতনে প্যান্টের পকেট থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে স্যাটালাইট ফোন, এবার ওটা খসে পড়ল। রানা সবই টের পেল, তবে খপ করে ধরবার উপায় নেই। সব জঞ্জালের সঙ্গে পাথুরে জমিতে গিয়ে পড়ল জিনিসটা। বুঝতে দেরি হলো না ওর, ওটার আয়ু শেষ। দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উষ্ণ পাথরের স্পর্শ লাগছে কপালে।

পাশেই ধুলোর চাদর উড়ছে। পাথর ও বালি পড়ছে উপর থেকে। তবে ধস কমে এসেছে। বইছে জোরালো হাওয়া, কিছুক্ষণের ভিতর সরে যাবে ধুলো। জঙ্গিরা উপর থেকে দেখতে পাবে রানাকে। পাথরের দেয়াল নেমে গেছে তিরিশ ফুট নীচে, সেখানে এবড়োখেবড়ো জমিন। ওখান থেকে এক শ' ফুট নামলে উপত্যকার জমিন।

ডানদিকে চাইল রানা, প্রায় থেমে এসেছে অ্যাভালাঞ্চ। বড় বোল্ডারগুলো পড়েছে নীচের জমিতে। এখন টিলার উপর থেকে পড়ছে বালির সরু রেখা।

ক্লাইম্বিঙের দ্বিতীয় নিয়ম: নেমে যাওয়ার পথ না জানলে খাড়া দেয়াল থেকে সরতে যেয়ো না।

রানার জানা নেই নীচে কী থাকতে পারে। হয়তো কোনও পাথর ধরতে পারবে, গর্তে রাখতে পারবে পা—কিন্তু উপর থেকে চেয়ে রয়েছে বিশজন সশস্ত্র লোক! নিশ্চয়ই জানতে চাইছে কোথায় গেছে তাদের সঙ্গীরা!

খুব ধীরে ভারসাম্য রেখে বসতে শুরু করল রানা, দু'হাত রেখেছে টিলার বুকে। অর্ধেক বসা অবস্থায় তাক থেকে নামিয়ে দিল ডান পা। গর্ত খুঁজতে শুরু করেছে। পাথরের দেয়ালে সামান্য একটা খোঁড়ল পেল। ওখানে রাখা যাবে শুধু বুটের তিন ভাগের একভাগ। গর্তটা ওর ওজন নেবে? ঝুঁকি নিল রানা, জুতোর ডগা ভরে দিল খোঁড়লে, এবার ধীরে নামাল অন্য পা। দু' মিনিট পর ভাঁজ করা দুই কনুই রাখল তাকের উপর। ডান পা গর্তের ভিতর থাকল, কিন্তু বাম পা সরিয়ে নিল, অন্ধের মত খুঁজছে বেড়ে থাকা পাথর বা গর্ত। এক মিনিট পেরুল, পায়ে কিছুই ঠেকল না। টিলার বুক দেয়ালের মত খাড়া।

ঠিক তখনই ওর মুখের পাশে নামল কুণ্ডলি পাকানো দড়ি। উপরে চাইল রানা। কেউ উপর থেকে দেখতে পাচ্ছে না ওকে। টিলা আড়াল দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ, ওকে বাঁচানোর জন্য দড়ি ফেলেনি টেরোরিস্টরা। নীচে কী ঘটেছে জানার জন্য লোক নামবে এখন। সৌভাগ্যক্রমে এখান দিয়েই ফেলা হয়েছে দড়ি।

আবার হাঁচড়েপাঁচড়ে তাকের উপর উঠে এল রানা, দ্রুত হাতে শার্টের কয়েকটা বোতাম খুলল। খুব সাবধানে খুলে নিল বাম পায়ের বুট, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকের সঙ্গে ঠেসে ধরল ওটা। বুটের সঙ্গে বার তিনেক জড়িয়ে নিল দড়িটা। চলনসই পুলি হলো। উপর থেকে দড়িতে ঝাঁকি শুরু হয়েছে। নামছে কেউ। জুতোর দুই পাশ দু'হাতে শক্ত করে ধরল রানা, তারপর টিলার বুকে পা রেখে নামতে লাগল। প্রতি বারে পাঁচ ইঞ্চির বেশি নামতে পারছে না। তবে উপরের লোকটা সহজে বুঝবে না নীচে কেউ আছে। সবার অজান্তে নেমে যাবে রানা, কোথাও লুকিয়ে থাকবে, রাতের আঁধারে চলে যাবে খনি এলাকায়। দেখতে হবে ওখানেই প্রধানমন্ত্রীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে কি না।

তিন মিনিট পেরুনোর আগেই টিলার গোড়ায় নেমে এল রানা।

উপর থেকে ভেসে এল চিৎকার, 'কাইয়ুম, একটু অপেক্ষা করো, আমরাও আসছি!' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝপাৎ করে রশি নামল আরও কয়েকটা।

দ্রুত হাতে বুট পরে নিল রানা, নামছে ঢাল বেয়ে। যে-কোনও সময়ে কার্নিশে পৌঁছে যাবে উপরের লোকগুলো। সামনে একটা ঢিবি পেয়ে তার পিছনে লুকিয়ে পড়ল রানা। হাঁপাচ্ছে। ঢিবির গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাইল। টের পেল, শরীর চলতে চাইছে না, বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। বুঝতে পারছে, শরীরের একটা হাড়ও ভাঙেনি, কিন্তু সারা শরীরের সবখানে টনটনে ব্যথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা শরীরে ফুটে উঠবে বেগুনি ও নীল দাগ।

মাত্র দশ সেকেণ্ড বিশ্রাম নিল রানা, তারপর কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে সরে বড়সড় একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল আবার।

এদিকে চাতালে নেমে এসেছে লোকগুলো। গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। নেমে এসে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ওরা। পালাও, পালাও, রানা!

কাছেই পরিচিত জিনিসটা দেখতে পেল রানা। বালির নীচ থেকে বেরিয়ে রয়েছে ওর কাফিয়ের একাংশ। কাপড়টা তুলে নিল ও, আবার পরে নিল মাথায়, ভাবছে, দৌড় শুরু করবে।

ওই যে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কার্নিশে পৌঁছে গেছে ওরা! নৈঃশব্দ্যের ভিতর জোরালো একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'গেল কোথায়? নীচে তো খালি পাথরের স্তূপ। মনে হয় চাপা পড়েই মরেছে।'

'দাঁড়াও,' মোটা গলা ভেসে এল উপর থেকে, 'চারপাশ ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে।'

অন্তরের গভীরে টের পেল রানা: এবার আর রক্ষা নেই, ধরা পড়ে যাচ্ছে ও। ভাগ্যের সহায়তা বারবার পাওয়া যায় না!

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

সূর্য-সৈনিক

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বন্দিশিবির থেকে অসহায় একদল মানুষকে নিয়ে ফিরছে রানা। ওদেরকে ধাওয়া করছে জঙ্গিদের ট্রাক, হেলিকপ্টার। তেড়ে আসছে সশস্ত্র বাহিনী। একের পর এক বাধা ডিঙাতে গিয়ে হাঁপ ধরে গেল রানার। উদ্ধার করা তো দূরের কথা, এখনও জানে না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় বন্দি করে রেখেছে ওরা। ওদিকে সোহেল খুঁজছে শুকিয়ে যাওয়া নদীতে প্রাচীন সেই কাঠের জাহাজ। খুঁজছে ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সেই গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া যেটা পাঠ করে শোনানো হবে সম্মেলনে। বিপদের পর বিপদ। অথচ হাতে সময় নেই। রানার মনে হলো, আর বুঝি সম্ভব হলো না প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করা! প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি আজই ঘোষণা দেবেন শান্তি মহাসম্মেলনের! চারদিক থেকে জাল গুটিয়ে এনেছে জঙ্গিরা! টিভিতে এখুনি দেখানো হবে: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মাথা কাটা পড়ার দৃশ্য! তা হলে কি পারল না রানা, হেরে গেল জঙ্গিদের কাছে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

সুমাইয়া রহমান বীথি, মোবা: ০১৯৪৪-৪৭২৭৯৩
বাসা-১৩, সে. ০৩, রোড-০১, দেওলা, টাঙ্গাইল।

চিঠিটা নতুন হলেও রানার সাথে প্রথম পরিচয় ২০০৫ সালে। তখন অষ্টম শ্রেণীতে ছিলাম। মরণযাত্রা দিয়ে শুরু, এখনও আছি, থাকব। জানেন, একেকটা বই পড়ি আর মনে মনে চিঠিতে কী কী লিখব তা ভাবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লেখা হয় না। কী করব, কোনওটাই যে মনমত হয় না! কিছু প্রশ্নের উত্তর খুব জানতে ইচ্ছে করে। তেমনি তিনটি প্রশ্ন পাঠালাম। প্লিইইইজ, উত্তর দেবেন। ১। শুভ্র পিঞ্জর-এ উল্লিখিত গ্রেগুল বা অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস কি সত্যি, না কল্পকাহিনি? ২। প্রিন্সেস হিয়াতে যে গ্রেট লেকস্-এর কথা লিখেছেন, এই গ্রেট লেকস্ কয়টি এবং কী কী? ৩। আপনার কোন রং ভাল লাগে?

শুভ্র পিঞ্জর-১ম খণ্ড ভাল লেগেছে। এবারের সুমেরু অভিযান ভয়ঙ্কর কিন্তু দারুণ! একটা সত্যি কথা বলব—আপনি চিঠিটা পড়বেন এই লোভেই চিঠিটা লিখেছি। আপনি ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

❋ ১. এটি একটি কল্পকাহিনি। যদিও পাঁচ কোটি বৎসর আগে এর অস্তিত্ব সত্যিই ছিল। ফসিল পাওয়া গেছে। ২. গ্রেট লেকস মোট পাঁচটি: উত্তর আমেরিকায়। লেক সুপিরিয়র, লেক হিউরন, লেক অন্টারিও, লেক ইয়ারি ও লেক মিশিগান। ৩. নীলের একটা শেড। ...আপনিও ভাল থাকুন।

অপু
২৪৮/বি, শহীদ সালাম বরকত হল, জা. বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

কাজীদা, শুভেচ্ছা নেবেন। আপনার লেখার একজন ভক্ত হিসেবে অনন্যোপায় হয়ে আপনার কাছে একটা সাহায্য চাইছি।

'খুনে পিশাচ' বইয়ের আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে চাটখিলের একজনের সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়, যেটা বোধহয় রানা-সোহানার সম্পর্কের মতই ছিল। কিন্তু আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি। সবকিছুর জন্য আমি তার কাছে ক্ষমা চাইছি। এই চিঠি সে পড়বেই। প্লীজ, কাজীদা, আপনি তাকে আমাকে ক্ষমা করতে ও যোগাযোগ করতে বলে দেন। আপনার কথা ও ফেলতে পারবে না। আশা করি একজন রানা ভক্ত হিসেবে আমাকে হতাশ করবেন না।

পরিশেষে যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের অগণিত রহস্যপ্রেমীকে তৃপ্ত করায় আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

❋ চিঠির মাধ্যমে প্রকাশিত আপনার আকুতিটুকু ছেপে দিলাম। কিচ্ছু না জেনে কাউকে কোনও অনুরোধ করা উচিত মনে করি না। আপনি যে ক্ষমা চাইছেন, সে খবরটুকু আপনার সোহানা কিংবা রানা জানলেই তো হলো?

বিধান কুমার রায়, মোবা: ০১৭৩০৩৫০৬০৭
ব্র্যাক, হাড়িভাংগা, লালমনিরহাট সদর, লালমনিহাট।

কাজীদা, নমস্কার।

আশা করি আপনার শরীর ভাল। আমি সেই ১৯৯২ সাল থেকে রানার একজন অন্ধ পাঠক। কোনওভাবেই রানা ছাড়া আমার চলে না। মায়ার সংসার জালে আটকা আমি তৃপ্তি ও মুক্তি পাই রানা পড়ে। কিন্তু গত ১৯.০৬.১২ তারিখ রোজ মঙ্গলবার রাত ১১.৫১ মিনিটে আমার হঠাৎ মনে হলো আপনার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে আমি রানা কোথায় পাব। তখুনি এই চিঠি লেখা। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি আমার আগে যেন আপনার কিছু না হয়। নইলে একদিকে রানা অন্যদিকে আপনার চিন্তায় আমার সুইসাইড করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। আর একটা কথা, আমার ছেলের জন্মগতভবে হার্টে ছিদ্র। ওর অপারেশন করাতে আমি শীঘ্রই ভারত যাচ্ছি। আমার ছেলের জন্য আশীর্বাদ করবেন।

❋ ওর জন্য আমার আন্তরিক শুভাশিস রইল। মনে জোর রাখবেন, নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। ...আমার মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। ওপারে গিয়েও চুটিয়ে লিখতে থাকব। আপনারা গিয়ে একগাদা নতুন বই পাবেন!

মোঃ আবু তালহা
৩৭/১ রজনী চৌধুরী রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা ১২০৪।

আশা করি ভাল আছেন। ভাল তো থাকতেই হবে। না হলে আমাদের একের পর এক ফ্যান্টাসটিক বই উপহার দেবেন কীভাবে? মাসুদ রানার বই হাতে পেলেই নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাই। এজন্য আম্মুর বকাও হজম করতে হয়। কিন্তু আমিও তো নিরুপায়। রানার বই হাতে পেলেই যে দুনিয়াদারি ভুলে যাই। একটা প্রশ্ন ছিল—রেবেকা সাউলকে কোন্ বইতে পাওয়া যাবে? দয়া করে প্রশ্নটার উত্তর পাঠাবেন। উত্তরটা পাওয়া খুবই জরুরি। পরিশেষে আপনার ও সেবা'র সকল লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

❋ রেবেকা সাউল রানা সিরিজে প্রথম এলো *বিদায়, রানা!!* বইটিতে। এরপর *প্রতিদ্বন্দ্বী* বইয়ে খুন হয়ে যায় দাতাকুর হাতে। ...শুভেচ্ছা রইল।